Half-yerly

e- journal

মুর্শিদাবাদ সন্দেশ

ষান্মাষিক জার্নাল

May 1 2018 No. 1 Volume I

A JOURNAL OF HISTORY

With the help of Itihas Parikrama

Published from Berhampore & Kolkata

সহযোগিতায় : ইতিহাস পরিক্রমা

কলকাতা ও বহরমপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত

মুর্শিদাবাদ সন্দেশ

ষান্মাষিক জার্নাল

MURSHIDABAD SANDESH : Half-yearly JOURNAL

(সত্যরঞ্জন বক্সী প্রতিষ্ঠিত)

ই- ম্যাগাজিন ভলিউম-১, নম্বর - ১, ১ মে ২০১৮,

১৭ বৈশাখ, ১৪২৫

A JOURNAL OF HISTORY

e-mag,Vol - 1 No - I 2018

With the help of

Itihas Parikrama

Published from Berhampore & Kolkata

সহযোগিতায় : ইতিহাস পরিক্রমা

কলকাতা ও বহরমপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত

e-mail: itihasparikrama@rediffmail.com

Editor's e-mail: syamaldas.adv@gmail.com

Copyright: MURSHIDABAD SANDESH

(A JOURNAL OF HISTORY)

Editor: Syamal Das

Publisher : Dipali Das

Address: Kolkata 114F/1D Selimpore Road, Kolkata-31

&

Berhampore W. B :

45/2, Daihatta Road, P.O. Khagra,

Dist. Murshidabad, P.S Berhampore,

West Bengal

PH.03324726255, 03482251353

9732585001, 9477002648

e-mail: itihasparikrama@rediffmail.com

Editor's e-Mail - syamaldas.adv@gmail.com

Kolkata Liaison Officer :

Dr. Keka Dutta Roy.

39 Mahanirvan Road. Kolkata-700029

Ph: 033-24640676, 9433295852

Published : May 1, 2018

Available at : ITIHAS PARIKRAMA

P.H.03482-251353, 9732585001,

PATIRAM BOOK STALL (Kolkata)

Composed by: Publisher's own arrangement

Cover Design: Syamal Das

Computer Design: Samir Saha, Printing Dispay, Kol- 700009

Price : Rs. 100 /- Compact Disk-. Rs. 75 /-

মুর্শিদাবাদ সন্দেশ (ষান্মাষিক জার্নাল)

MURSHIDABAD SANDESH : Halfyearly JOURNAL

ই- ম্যাগাজিন ভলিউম-১, নম্বর - ১, ১ মে ২০১৮, ১৭ বৈশাখ, ১৪২৫

(A JOURNAL OF HISTORY e-mag,Vol - 1 No – 1 , 2018)

সূচিপত্র

১. প্রয়াত প্রীতিকুমার মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ ----- --- পৃষ্ঠা- ৫

২. প্রয়াত ইকবাল রসিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ -------- --- পৃষ্ঠা- ৯

৩.সম্পাদকীয় : সংবিধানে কৌশলী সমাজতন্ত্রের দাপটে

'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বিলুপ্ত হতে চলেছে - --- পৃষ্ঠা – ১১

৪.উত্তর সম্পাদকীয় : ভোট ব্যাঙ্কের টানে সংসদকে ব্যবহার -

সংবিধানকে অমান্য ,বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সরকারের ,

সংসদ ও বিচার ব্যবস্থার টানাপোড়েনে --"ঐতিহ্যবাহী কৃষি-অর্থনীতিই বিপন্না" --- পৃষ্ঠা – ১৫

৫. সুধীরকুমার মিত্র – জন্ম - শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য -------- ---পৃষ্ঠা – ২২

৬. শতবর্ষ পেরিয়েও অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায় প্রাসঙ্গিক - ডঃ চিত্তব্রত পালিত -পৃষ্ঠা – ২৪

৭. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মতিলাল শীল ---পৃষ্ঠা – ২৭

৮. নীরবে পেরিয়ে গেল বাংলার রেঁনেসার অন্যতম স্তম্ভ মতিলাল শীলের

জন্মের সোয়া দুশো বছর ---পৃষ্ঠা– ৩৮

৯.মুর্শিদাবাদের বিদ্যোৎসমাজ (১৮৫৩-১৯৪৭) - অনিরুদ্ধ দাস ---- ---পৃষ্ঠা – ৪৭

১০.বাঙালীর তুলিতে বাঙালী ভাস্বর ভারতের সংবিধান৷ - শ্যামল দাস ---- ---পৃষ্ঠা – ৫৫

১১.সুবে বাংলার গদ্দিনসীন বেগম ---- ---পৃষ্ঠা – ৫৯

-সৈয়দ আসিফ আব্বাস মীর্জা ও রোকসানা মীর্জা

১২. মুর্শিদাবাদে চড়ক বা গাজন উৎসব - ''সংবাদ' ---পৃষ্ঠা– ৬৫

প্রচ্ছদ ছবি - চড়ক

১.প্রয়াত প্রীতিকুমার মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কারে ও দানে অগ্রণী ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল প্রাতঃস্মরণীয় মতিলাল শীল আর বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে মতিলাল শীলেরই দৌহিত্র বংশীয় সলিসিটর ও এটর্নি কালিদাস মল্লিক যুগের দাবি মেনে ক্যামাক স্ট্রেটের বহু মূল্যবান সম্পত্তিকে ট্রাস্ট আইনের আওতায় এনে 'কালিদাস মল্লিক ১ নম্বর চ্যারিটেবিল ট্রাস্ট' গঠন করে গান্ধি পিস্ ফাউন্ডেসন্, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, সুবর্ণ বণিক সমাজ, হিন্দু সৎকার সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রভৃতি অন্তত কুড়িটির বেশি ফিল্যানথ্রপিক সংগঠনকে তাঁদের মহান উদ্দেশ্য সাবলীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ দুর্মূল্যের বাজারে মাসিক লক্ষাধিক টাকা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে আপামোর জনগণের সেবায় নিজের সম্পদকে কাজে লাগাবার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তারই পথ ধরে পিতার মৃত্যুর পর ঐ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হয়ে কালিদাসবাবুর ইচ্ছার একশো শতাংশ পূরণের পরও সমাজসেবার পরিধিকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই বাংলার সীমানা ছেড়ে দেশের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন কালিদাস বাবুর যোগ্য উত্তরাধিকারী মধ্যম পুত্র প্রীতিকুমার মল্লিক।

ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ প্রীতিকুমার ভারত বয়েজ এন্ড স্কাউট, ব্রতচারী ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের শরীর ও মনকে যেভাবে শৃঙ্খলা পরায়ণ হিসাবে তৈরি করেছিলেন পরবর্তীতে কি সংসারজীবনে কি সাংগঠনিক কাজে বিশৃঙ্খল অনিয়ম ও উদ্ভ্রান্ত ব্যস্ততার মাঝে অনেকেই তাঁকে বুঝে উঠতে পারেননি। ফলতঃ বেশকিছু জনের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রাত্য। তবুও তিনি দমে যান নি। পিতার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে সম্প্রসারণ ঘটাতে এবং সাংগঠনিক কাজে ও সমাজসেবায় বিগত আট ও নয়ের দশকে সমাজের মধ্যে অকুতোভয় প্রীতিকুমার মল্লিক হয়ে উঠেছিলেন একটি সর্ব্জন উচ্চারিত বলিষ্ঠ নাম।

জন্ম ৮৩ সেন্ট্রাল এভিনিউ– এর পৈত্রিক বসত বাড়িতে ১৯২৯ সালের ৯ মে। সেদিনের ঐ দিনটি ছিল বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ। পিতা কালিদাস মল্লিক , মাতা আরতি মল্লিক। মা বাবার দ্বিতীয় সন্তান প্রীতিকুমার মল্লিক। অগ্রজের নাম কল্যাণ ও দুই কনিষ্ঠের নাম কমল ও বিমল। কমল ছিলেন ডাক্তার আর বিমল অধ্যাপক। প্রীতি ছেলে বেলায় পড়েন হিন্দু স্কুলে। এর পর পড়াশুনা প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তারপর লন্ডনে যান কোম্পানি সেক্রেটারি নিয়ে পড়তে। অবশেষে ঐ পরীক্ষার ইন্টার দিতে না দিতেই ঠাকুরদা আদরের নাতিকে ডেকে নেন ভারতে। বলেন, 'বিদেশে পড়তে হবেনা। দেশে এসে চাকরি করলেই চলবে'। তখনো ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ঠাকুরদা কান্তমোহন। প্রীতিমল্লিক কোম্পানি সেক্রেটারি পাঠে ফাইনাল না দিয়েই চলে আসেন দেশে। চাকরি নেন প্রথমে হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে, তার পর জয় ইঞ্জিনিয়ারিং–এ।

ঠাকুরদার আদরই বা হবেনা কেন এর আগে ১৯৪৬ এর কলকাতার দাঙ্গায় দুষ্কৃতিরা সি আর এভিনিউ এর বাড়ি লুঠের সময় কল্যাণ ও প্রীতিকে ধরে নিয়ে যায় রাস্তায়। সেখানেই ধারাল অস্ত্র চালানো হয় দুই ভাইয়ের গলায় মাথায় ও পেটে। গুরুতর জখম বুঝে এবং জীবনের আশা নাই নিশ্চিন্ত হয়ে মেডিকেল কলেজের কাছের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে চলে যায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐ

দুষ্কৃতিরা। এরই কিছুপরে ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন মেডিকেল কলেজের এক মেমসাহেব মেট্রন। ডাস্টবিনের কাছে দুই রক্তাক্ত যুবককে পড়ে থাকতে দেখে প্রকৃত পক্ষেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেগেলের উত্তরসূরী মমতাময়ী ঐ সেবিকা গাড়িথেকে নেমে দেখেন তখনও প্রাণ আছে দুই ভায়ের। ড্রাইভার ও সহকারীর সাহায্য নিয়ে তুলে নিয়ে যান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পরম যত্নে বাঁচিয়ে তোলেন দুই ভাইকে। পরবর্তীতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি যে বিভাগে কল্যাণ ও প্রীতি নবজীবন লাভ করেছিল, বাবা কালিদাস মল্লিক সরকারের সঙ্গে পত্র বিনিময় করে মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি ঐ বিভাগের মূল্য ধরে তা সরকারের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজকে দান করলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের নাম রেখেদেন কল্যাণ–প্রীতি ওয়ার্ড। যা আজও পুরাতন ঐ স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই সেই মেডিকেল কলেজ । যার স্মৃতি এই পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। নস্টালজিয়াও বলা যেতে পারে। স্মৃতির বীজ তো রোপিত হয়েছিল প্রায় দুশো বছর আগে। যখন কালিদাসবাবুর প্রপিতামহী র পিতামহ মহান মতিলাল শীল এই মেডিকেল কলেজই স্থাপন করতে দিয়েছিলেন কলুটোলায় তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি সংলগ্ণ মূল্যবান বাগানের জায়গা– দান করে ছিলেন নগদ প্রায় এককোটি টাকা। শুধু কি স্মৃতি আর নস্টালজিয়া (ব্লু ব্লাডের) নীল রক্তের টানই বা কম কিসে। পূর্বপুরুষের দানকৃত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুই পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে, অসামান্য সেই কৃতজ্ঞতার কাছে সামান্য দান করে এইভাবেই ঋণ স্বীকারের প্রয়াস পেয়েছিলেন কালিদাস মল্লিক।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং – এ লকআউট ঘোষণা হলে পিতৃপ্রদত্ত বিষয়আশয় দেখতে থাকেন প্রীতিবাবু। পিতামহ কান্তমোহন মল্লিকের নির্দেশ মতো মধ্য বয়েসেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। হাওড়ার সান্ধ্যবাজার ষোল আনা, বিখ্যাত মঙ্গলা হাটের একাংশ ইত্যাদি ছিল তাঁর বিপুল সম্পত্তির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

বিয়ে হয় ১৯৫১ সালের ১৩ জুলাই উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবার সুরেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা প্রতিমার সঙ্গে। চিরকালই ছিলেন ভ্রমণ বিলাসী ও সংগঠন প্রিয় । হিসাবশাস্ত্রে ছিলেন পণ্ডিত। মাঝে মাঝেই চলে যেতেন দেশে বিদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। বিষয় সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে মন ছিল না। সম্পত্তি রক্ষার জন্য জটিলতাও পছন্দ করতেন না। কোন রকম ঝামেলা একেবারেই ধাতে সইত না। ঝামেলার বিষয় আশয় থেকে মুক্তি পেতে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতেও পিছুপা হননি। সুখ থেকে শান্তি পাওয়াই ছিল তাঁর জীবন দর্শন। বলতেন জাগতিক সুখের কোন স্থায়িত্ব নাই। শান্তিতে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটানোর অভিপ্রায়ে মুসৌরীতে পাহাড়ের কোলে অসংখ্য গোলাপ গাছ দিয়ে ঘেরা শান্তির নীড় একটি বাংলো কিনেছিলেন। বছরের অর্ধাংশ সময় কাটাতেন সেখানে। কিন্তু সে সুখ বেশীদিন টেকেনি। আইন রক্ত চক্ষু দেখিয়ে বছরের অর্ধাংশ বন্ধ থাকা ঐ বাংলো বাড়ি হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিল।

সংগঠন প্রিয় প্রীতি কুমার মল্লিকের দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবন শুরু হয় ১৯৭৯ সালে যখন পিতা কালিদাস মল্লিক সুবর্ণ বণিক সমাজ কলকাতাকে পলিক্লিনিক করার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ঐ বছরই ২০ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদন ক্রমে সুবর্ণবণিক সমাজ কলকাতা সেবায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য ‘কালিদাস মল্লিক ১ নম্বর চ্যারিটেব্ল ট্রাস্ট’প্রাথমিক ভাবে ছয় লক্ষ টাকা দান করে বিরলতম নজির সৃস্টি করলে প্রীতিকুমার মল্লিক সুবর্ণ বণিক সমাজের গৌরবময় ইতিহাস ও সমাজসেবামূলক কাজ কর্মে আকৃষ্ট হয়ে এর স্রোতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮১ সালের ১৫ জানুয়ারী কালিদাস মল্লিক প্রয়াত হন। প্রীতি মল্লিকের কাঁধে এসে পড়ে পিতার অপূরিত কাজ সমাপন করার গুরু দায়িত্ব । এসেযায় সুবর্ণবনিক সম্প্রদায়ের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস ও

সংস্কৃতির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। সে সময় কলকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের কর্ণধার (সভাপতি) ছিলেন কর্মযোগী ডাঃ সুবলচরণ লাহা। সমাজ সেবা মূলক যে কোন কর্মোদ্যোগকে তিনি উৎসাহ দিতেন। ফলতই প্রীতিকুমার ডাঃ সুবল লাহার সাহচর্যে সমাজ উন্নয়নে এগিয়ে চললেন। সমসাময়িক সময়ে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ' খাগড়া বৈশ্য সুবর্ণ বণিক সমিতির পরিচালনায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অন্যান্য বহু স্থানের মতোই শতাধিক বৎসর ধরে পালিত হয়ে আসছিল সুবর্ণ বণিকদের ত্রাতা শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর ত্রেতাযুগের রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণের খেলারসাথি পঞ্চম গোপাল বলে কথিত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোধান তিথি দিবস। কিন্তু অযোধ্যা থেকে আগত স্বর্ণবণিক সম্প্রদায়কে রাজা আদিশূর ঢাকার কাছে মেঘনা নদীর তীরে সুবর্ণগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়ে 'সুবর্ণবণিক' নাম দিয়ে মর্যাদার আসনে বসিয়ে ছিলেন, যাঁরা ছিলেন এই বাংলার ব্যঙ্কার, যাঁদের সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্ ছিল উঁচুতারে বাঁধা। তাদের প্রতি ঈর্শান্বিত হয়ে বিনা সিকিউরিটিতে যুদ্ধে যাওয়ার টাকা ধার না পেয়ে রাজা বল্লাল সেনের ফরমানে শুধু মাত্র রাজনীতির কূট চালে এই সম্প্রদায়কে শূদ্রে এবং অস্পৃশ্য ও অসূচি বলে চিহ্নিত করে সমাজে অবদমিত করে রাখা হয়ে ছিল বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে। যাঁরা নিজেদের শৌর্য্য ও বীর্য্যে ছিলেন অগ্রগণ্য তাঁরা কিন্তু সমাজে অশ্পৃস্য ও অসূচি বলে অবদমিত থাকেননি। এগিয়ে থেকেছেন সকলের থেকে বেশ কয়েক কদম। বল্লালি ফরমানেরও পাঁচ শতাধিক বৎসর পর শ্রীচৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে কথিত শূদ্র প্রকৃত বৈশ্যে পরিণত হয়ে দান ধ্যান বিদ্যা শিক্ষা ও সংসৃক্তি চর্চায় অগ্রগণ্য হয়ে এগিয়ে চলার কর্মসূচি কার্য্যকরী করার মানসিকতার জয়ে এগিয়ে আসা বহরমপুরের যুব নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় আকৃষ্ট হন ডাঃ সুবল চরণ লাহা ও প্রীতিকুমার মল্লিক। বহরমপুরের ঐ যুবনেতৃত্বের প্রস্তাবেই কলকাতা সুবর্ণ বণিক সমাজ তাদের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর সঙ্গে সারা বাংলা সুবর্ণ বণিক সম্মেলনেরও কর্মসূচী গ্রহন করে। প্রীতিমল্লিকের পৃষ্ট পোষকতায় গড়ে ওঠে বঙ্গীয় সুবর্ণ সমাজ। ইতিহাস থেকে দেখা যায় এরও প্রায় ষাট বছর পূর্বে এই কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজের তৎকালীন সভাপতি নরেন্দ্র নাথ লাহার প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বংলায় বিভিন্ন জেলায় কুড়িটিরও বেশী সুবর্ণ বণিক সম্মেলন হয়েছিল। প্রীতি মল্লিকের প্রচেষ্টায় ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বঙ্গীয় সম্মেলন ও পুরীতে একটি সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন সহ চল্লিশটিরও বেশী স্থানীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বসুরী দানবীর মতিলাল শীলের দ্বিশত বর্ষ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯০ সালে কলকাতার মহাজাতি সদনে ও বিহারের চাষে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় ঐ দানবীরের জন্ম দ্বিশত বার্ষিকী উদ্যাপন ও বিহারে প্রথম বিধবা বিবাহের প্রচলন। এই সেদিন ২০১২ সালেও তাঁরই উৎসাহে বাঁকুড়া শহরে ও ছাতনা কেঞ্জেকুড়ায় বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সমাজের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ লাহার মতই প্রীতিকুমার মল্লিক মনে করতেন ' বিভিন্ন সভা সমিতি ও সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে' আর এই সামাজিক সম্প্রীতিই ক্রমে জাতীয় সম্প্রীতিকে সম্বৃদ্ধ করে। ছিলেন হিন্দু স্কুলের প্রাক্তনী এসোসিয়েশন ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির কার্য্যনির্বাহী সংগঠক। সাংগঠনিক স্তরে সততা ও নিয়মানুবর্তিতাই ছিল তাঁর চরিত্রের মূলধন।

''কালিদাস মল্লিক ১ নম্বর চ্যারিটেব্ল ট্রাস্টের ট্রাষ্টি' হিসাবে পিতার কাজকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আসমুদ্রহিমাচল। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার সঙ্গে মামলায় জিতে বহু টাকা পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে হিমালয়ের বদ্রীনারায়ণ, হরিদ্বার, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, বারানসী, ঘাট– শীলা, বোম্বাই–এর নিউ ভাসী, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি স্থানে করে দিয়ে ছিলেন পর্য্যটন আবাস্।

এ হেন বর্ণময় জীবনের অধিকারী দানবীর মতিলাল শীল থেকে কালিদাস মল্লিক, দানের জগতের প্রকৃত উত্তরসূরী , কলকাতা তথা বাংলার সাংগঠনিক জগতের অন্যতম স্থপতি প্রীতিকুমার মল্লিক চলে গেলেন সামান্য কয়েক দিন রোগভোগের পর গত ১৫ মে সকালে – রেখে গেলেন স্ত্রী প্রতিমা মল্লিক, পুত্রদ্বয় প্রণব ও প্রবীর, দুই বধুমাতা ইন্দিরা ও রুমেলি তিন পৌত্রী শুভলিনা, নিলাঞ্জনা ও সৌমিতা দুই নাতজামাই এবং এক পোল নাতি ঋতব্রত ও অসংখ্য

আত্মীয় বন্ধু ও পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীকে।

তিনি শুধু বহরমপুরের অভিলেখ্যাগার ইতিহাস পরিক্রমা ও মুর্শিদাবাদ সন্দেশ পত্রিকার উপদেষ্টাই ছিলেন না ছিলেন প্রেরণাদাতাও। এই দুই সংস্থার কর্ণধারদের তিনি ছিলেন পারিবারিক বন্ধু। সমাজ জীবনে তাঁর অভাব চিরকালই অপূরিত থেকে যাবে।

আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই অন্তরের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উঠেআসা শ্রদ্ধার্ঘ্য ।

দীপালি ও শ্যামল দাস তাঁদের পরিবারবর্গ এবং ‘ইতিহাস পরিক্রমা’ ও

‘মুর্শিদাবাদ সন্দেশ’ – এর সকল সদস্য।

———— ০ ----------

২.প্রয়াত ইকবাল রসিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

সড়ক দুঘটনায় চলে গেলেন মুর্শিদাবাদ সন্দেশ পত্রিকার সাংবাদিক, ইতিহাস পরিক্রমা নামক অভিলেখ্যাগারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সাংবাদিক সংঘের প্রাক্তন সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সজ্জন ব্যক্তি, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বেলডাঙ্গা হাটের অন্যতম অংশীদার ইকবাল রসিদ গত ৬ মার্চ দুপুর পৌনেদুটোয় বেলডাঙ্গা অশ্বিনী ফিলিং স্টেশনের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর উল্টোদিক থেকে সীমাহীন জোরে আসা একটি বৃহৎ ট্যাঙ্কারের সঙ্গে তাঁর মারুতি ওমনি গাড়ির মুখোমুখি

সংঘর্ষে। সাবধানী সংযমী ইকবাল নিজেই তাঁর গাড়ির চালক ছিলেন। ময়না তদন্তের পর ঐদিনই রাত্রে তাঁর মরদেহ বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত দেবকুন্ডু গ্রামে পারিবারিক কবর খানায় সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে ইকবালের বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। মৃত্যুর সময় তিনি এক পত্নী, এক পুত্র, দুই কন্যা, দুই জামাতা ও চার নাতি নাতনীকে এবং অসংখ্য আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে রেখে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসেন আবালবৃদ্ধবনিতার চোখ দিয়ে ঝর্ণাধারার মতো জল পড়তে থাকে। ছুটে আসেন বেলডাঙ্গা পৌর সভার পৌরপতি ভরত ঝাঁওর, বিধায়ক রবিউল ইসলাম, বিধায়ক সফিউজ্জামান, দেবকুন্ডু এস্টেটের বর্ষীয়ান অংশীদার সেখ মনিরুজ্জামান সহ ঐ এস্টেটের সকল অংশীদারগণ ও অসংখ্য গ্রামবাসী। ইতিহাস পরিক্রমার কর্ণধার ও মুর্শিদাবাদ সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দাস স্বপত্নীক পরদিন অপরাহ্নে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবারের সকলকে সান্তনা দেন। ইতিহাস পরিক্রমার সভাপতি প্রভাতকুমার ধর , মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্তন জি পি ও বর্ষীয়ান আইনজীবী দীপক রায়, আইনজীবী স্বপন মুখার্জী, আইনজীবী জিল্লার রহমান , বর্ধমানের ল্যান্ড হোল্ডারর্স এসোসিয়েসনের কর্মকর্তা গৌর কোয়াঁর প্রমুখ গুণিজন শোক জ্ঞাপন করেন।

ইকবাল রসিদের জন্ম ১৯৫৫ সালে বেলডাঙ্গায়। তাঁর পিতার নাম ছিল মোমিন রসিদ ও মাতার নাম ছিল নসিবা খাতুন। বাল্যকালে দেবকুন্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে বিজ্ঞানে সসম্মানে স্নাতক হন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেন।

ইকবাল খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন, পারতেন ভাল গীটার বাজাতে। ছবি আঁকা ও গীটার বাজানোর নেশা সংসারের চাপে কেটে গিয়ে ইকবাল পিতামহ ত্যক্ত বাংলোকে ফুলে ও ফল গাছে ছবির মতো সাজিয়ে তুলে ছিলেন। বেলডাঙ্গায় ইকবালের বাগিচা বর্তমানে এক দ্রষ্টব্য স্থান।

ভালবাসতেন ঐতিহ্যকে। পারিবারিক ঐতিহ্যকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন। হাজি সেখ নকিবুদ্দিনের পৌত্রের পৌত্র তিনি। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ গরুর হাটকে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে বিভিন্ন লোভি হিংসাপরায়ণ কুচক্রী ও দুষ্কৃতিদের হাতথেকে বাঁচাতে আমরণ লড়াই করে গিয়েছেন। পিতামহ আবদুর রাজ্জাক ছিলেন দানশীল। প্রায় সত্তর বৎসর আগে বেলডাঙ্গায় যখন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিলনা তখন তাঁর বাংলোর দক্ষিণে জাতীয় সড়কের পশ্চিমে প্রায় পনের বিঘা জমি দান করে হাসপাতাল করে দেন।

ইকবালও পিতামহের পদানুস্মরণ করে ২০০৯ সালে দেবকুন্ড গ্রামে এক খণ্ড জমি দানকরে হাজি আবদুর রাজ্জাক মেমোরিয়াল গার্লস হাইমাদ্রাসা নামে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র মহিলা হাই মাদ্রাসা স্থাপন করে দেন। তাঁর বাংলোর পারিপার্শিকের পরিবেশ সুস্থ রাখতে ও এলাকায় অসামাজিক কাজ রুখতে তাঁর এক সুহৃদের পরামর্শে মসজিদ ও মাদ্রাসা করতে নির্দ্দিষ্ট জায়গা রেখে ওসিয়ত করেগিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি।

মুর্শিদাবাদ ৩০০ কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে সহকর্মীদের সঙ্গে ঘুরে ঐতিহ্যের তালিকা তৈরী করতে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ইতিহাস বিশ্রুত ধ্বংস প্রাপ্ত ভগবানগোলা বন্দর আবিস্কারে তাঁর সহযোগিতা ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ছিলেন শান্ত স্বভাবের ধর্মপ্রাণ সৎ ও সরল মানুষ। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে পাছে সুদ নিতে হয় সে জন্য ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না। কোনরকম তামাক ও অন্য কোন নেশা ছিলনা তাঁর। ফরাজী সম্প্রদায়ের এই ব্যক্তি , মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ মেনে নিতে পারতেন না। বলতেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের

মধ্যে কেবল পার্থক্য কাল্‌চারের। অসাম্প্রদায়িক এই ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে তাই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই চোখের জল ফেলেছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক সৎ সংস্কৃতিবান ও বস্তুনিষ্ঠ নাগরিককে হারালাম। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

দীপালি ও শ্যামল দাস তাঁদের পরিবারবর্গ এবং 'ইতিহাস পরিক্রমা' ও

'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ' – এর সকল সদস্য।

———— ০ ----------

৩.সম্পাদকীয়ঃ

সংবিধানে কৌশলী সমাজতন্ত্রের দাপটে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বিলুপ্ত হতে চলেছে

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র চরিত্র 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। এদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের স্থান নাই। ভারতের সংবিধান প্রস্তুত প্রণালী লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে 'ইন্টেনশন অব্ দ্য কনস্টি টিউয়েন্ট এসেমব্লি ' বা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উদ্দেশ্যই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে নিয়ে এদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বা 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা। সোভিয়েত রাশিয়ার মতো 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র আদলে এদেশকেও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গঠন করা বিষয়ে 'কনস্টি টিউয়েন্ট এসেমব্লিতে'যে আলোচনা হয়নি তা নয় কিন্তু আলোচনা হলেও সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো প্রস্তুত না থাকায় এবং ভারতের মতো ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র আমদানী করতে চাননি সংবিধান প্রণেতারা। সেইজন্যই ভারতের মূল সংবিধান গ্রন্থের প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত কোন স্থানেই 'সমাজতন্ত্র' নামে একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ রাজনীতিকদের সুবিধাবাদী উদ্দেশ্যের চাপে বারবার সংবিধান সংশোধন করে গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে মুছে দিয়ে কাজে না হলেও 'মুখে সমাজতন্ত্র ' নিয়ে এসে একের পর এক পদক্ষেপ

নিয়ে গণতন্ত্রেরই নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছেন রাজনীতিকেরা।

ভারতের সংবিধান প্রস্তুত শুরু হয় ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই ১৯৪৬ সালে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটি বা 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লির' প্রথম সভা হয় ১৯৪৬ সালের ১০ ডিসেম্বর। এতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রায় ২৭৫ জন প্রতিনিধি। 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লির' চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সঞ্চালক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এই কমিটির প্রথম কয়েকটি সভা বসে ঐ বছরেরই যথাক্রমে ১০, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২৩ ডিসেম্বর এবং ঐ সভাগুলিতেই নির্ধারণ হয়ে যায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্র চরিত্র।

'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লিতে' ছিল তৎকালের ভারতবর্ষের সর্ব বৃহৎ দল কংগ্রেসের প্রভাব। মুসলিম লীগ 'কনস্টি টিউয়েন্ট এসেমব্লিতে ' অংশ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেসের প্রভাব থাকলেও তা ছিল দ্বিধা বিভক্ত। সংখ্যা লঘিষ্ট হলেও সোস্যালিস্ট ভাবধারার ব্যক্তিগণই ছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে অগ্রগামী । এবং সেই অগ্রগামী অংশের প্রতিনিধি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হওয়ার পর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পৌরোহিত্যে ১৩ ডিসেম্বরের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পাঠ করার সময় সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একবারের জন্যও বলেননি যে, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক- সোস্যালিস্টিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হতে চলেছে। বরং এ বিষয়ে প্রশ্ণ উঠলে জহরলাল বলেছেন তিনি চান না পশ্চিমী গণতন্ত্রকে নকল করতে। ঐ গণতন্ত্রকে আরও উন্নতমানের গণতন্ত্রে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তিনি চান এ দেশ যেন একদিন সমাজতান্ত্রিক দেশ রূপে পরিগণিত হয়। যদিও ঐ সময় জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তাঁর ভাবশিষ্য জহরলাল নেহেরুর মতাদর্শগত বিরোধ ছিল । বিরোধের মূলে ছিল মহাত্মাজীর গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে নেহরুজীর 'সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার' ধ্যানধারণার অমিল। গান্ধিজী মনে করতেন প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র শুরু হয়ে তা দীর্ঘ দিন ধরে সমৃদ্ধ হতে হতে পরিণতি পেয়ে এসেছে। কিন্তু নেহেরুজী মনে করতেন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আমদানী তাই পশ্চিমের গণতান্ত্রিক ধারণা যখন ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছে এবং ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা যখন পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানের বেশীর ভাগ মানুষ গ্রহণ করেছেন তখন সমাজতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য। কিণ্তু তৎকালের পরিস্থিতিতে গান্ধিজীর বিরোধিতা করা ছিল বাতুলতা। এই সব ভেবেই গান্ধিজী তাঁর মনপছন্দ না হওয়া যে 'কনস্টি টিউয়েন্ট এসেম্বিলি'তে অংশ গ্রহণ করেননি সেই 'কনস্টি টিউয়েন্ট এসেমব্লি'তে ১৩ ডিসেম্বর সংবিধানের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুশলী কূটনীতিকের মত পণ্ডিতজী বলেছিলেন,'There is another person who is absent here and who must be in the minds of many of us today-the great leader of our people, the father of our Nation (applause)-who has been the architect of this Assembly and all, that has gone before it and possibly of much that will follow. He is not here because, in pursuit of his ideals, he is ceaselessly working in a far comer of India. But I have no doubt that his spirit hovers over

this place and blesses our undertaking.'

সেদিন গান্ধি ভজনা করতে করতে গান্ধিজীর বিরুদ্ধতা করা ছাড়া নেহেরুর আর কোন উপায় ছিল না। কেননা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পিছনে ভারতের প্রতিবেশী দেশ, পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছুটছে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের দিকে। সোভিয়েত রাশিয়ার রক্তক্ষয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আতঙ্কে ভারতের পুঁজিপতি, মধ্যবিত্ত ও অল্প মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন আতঙ্কগ্রস্ত। পণ্ডিত নেহেরু নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছিলেন তিনি পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। তবুও সমাজতন্ত্র সঠিক ভাবে বুঝুন আর না বুঝুন অন্তত রাজনীতির কূট চাল চালতে গিয়ে নেহেরু সমাজতন্ত্রের সমর্থক বলে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মন জয় করে নিয়েছিলেন। আবার প্রকাশ্যে গান্ধি বিরোধিতা করা যাবেনা বলে নেহেরু গান্ধিজীর পথ বেয়েই স্বীকার করে নিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিগত ৫ হাজার বছরের ইতিহাসের গতি পথেই আমরা একটি নতুন যুগে পা রাখতে চলেছি। একদিকে গান্ধিজী সমর্থিত ভারতের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্র, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র এই দুই আদর্শের টানাপোড়েনে নেহেরুজী নাজেহাল হয়েই এক 'সোনার পাথরবাটির ত্বত্ত৵ খাড়া করলেন। নাম দিলেন 'সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা'। বললেন সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র আসবে। যা ছিল মার্কসবাদে পরিত্যক্ত। পণ্ডিত নেহেরু নিজেই সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র আসবে বলে মত প্রকাশ করছেন সুতরাং বিশ শতকের মাঝামাঝিই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ঐ তত্ত৵কে সমর্থন করে কার্যতই দলটিকে কংগ্রেসের 'বি' টিমে পর্যবসিত করে তুলেছিলেন।

এতসব করেও এবং 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি'তে কমিউনিস্টদের সমর্থন পেয়েও প্রবল বিরোধিতায় নেহেরুজী কিন্তু ভারতের সংবিধানের প্রথম থেকে শেষ কোন স্থানেই 'সমাজতন্ত্র' নামে শব্দটি বসাতে পারেননি।

সংবিধান প্রস্তুত নিয়ে সভা শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আর শেষ হয়ে তা ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ইন্ডিয়া গেজেট অব্ ইন্ডিয়াই প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী। সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক ১৫ মাসের মাথায় ১৯৫১ সালের ১০ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংবিধানের ১ম সংশোধনী এনে ভাল ভাল কথার আড়ালে গণতন্ত্রের ডানা ছেঁটে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার নামে সৈরতন্ত্রের জন্ম দিলেন। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তৈরী করা আইন বিচার ব্যবস্থার শাসনে অসাংবিধানিক বলে পরিগণিত হচ্ছে বলে ধূয়া তুলে নেহেরুজী ভারতের সংবিধানের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছদে সম্পত্তির অধিকার যে ধারায় রয়েছে সেই ৩১ নম্বর ধারার পর ৩১বি ধারা সংযুক্ত করে নবম তপশীল বলে একটি সংরক্ষিত ঘর তৈরী করে দিলেন। যে ঘরে ঢুকতে পারলে ঐ আইনগুলিকে বিচার ব্যবস্থা আর স্পর্শ করতে পারবে না। সংবিধানের ১ম সংশোধনী বিল এনে নবম তপশীল তৈরী করে সরকার বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের ১১টি জমিদারী অধিগ্রহণ ও

জোতদারী অধিগ্রহণের আইন ঐ নবম তপশীলে ঢুকিয়ে দিয়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করলেন৷ এরপর বিগত প্রায় সাতষট্টি বছরে ভারতের সংবিধানের অন্তত ১১টি সংশোধনীতে দেশের সবগুলি রাজ্যের ২৮৪টি আইন নবম তপশীলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ঐ সব আইনেই নাগরিকদের তার সম্পত্তি মালিকানার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়৷ সম্পত্তির অধিকারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বাইরে সাধারণ সাংবিধানিক আইনী অধিকারের আওতায়৷ এই উদ্যোগ মার্কস-এঙ্গেলস্ এর "কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের 'ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপের আহ্বানের' পরিপূরক ছাড়া আর কিছু নয়৷ আর এরই সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুবিধাবাদী ভোট রাজনীতি করতে ভূস্বামীদের প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর 'ব্যক্তি সম্পত্তি ' ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী অসেচ এলাকায় এক হেক্টর সমান সাড়ে দশ বিঘা প্রায় বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী পঁয়তাল্লিশ নয়াপয়সা বিঘা হিসাবে সরকারে ঐ দু কোটি দশ লক্ষ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে ক্যাডারদের মধ্যে দুকাঠা চারকাঠা করে বিলিয়ে দিয়ে এই রাজ্যে তাদের এক বিশাল ভোট ব্যঙ্ক গড়ে তুলেছিলেন৷ শুধু তাই নয় এমন কথাও বলা হচ্ছে যেহেতু সংসদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থেকে সম্পত্তির অধিকার মুছে ফেলা হয়েছে সেই হেতু ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপ করে সমাজতন্ত্র আসতেও নাকি আর বেশী দেরি নাই৷ ফলে সাধু সাবধান৷ ব্যক্তি মালিকানাধীন কল কারখানা মল শিল্পতালুকের মালিকানাও হইতো একদিন বিনাপয়সায় অধিগ্রহণ করে ক্যাডারদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে? ভোট ব্যাঙ্কের তাগিদে৷

পণ্ডিত নেহেরু সংবিধানের প্রথম সংশোধনী এনে কল্পিত সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ার যে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি আরও দুই ধাপ এগিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে সংবিধানের ৪২ ও ৪৪ তম সংশোধনীতে সংবিধানের অবজেকটিভের উদ্দেশ্যর মধ্যে সমাজতন্ত্র শব্দটি ঢুকিয়ে এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার থেকে আর্টিকেল ৩১ বা 'ব্যক্তি সম্পত্তি' রাখার অধিকারকে মুছে দিয়ে প্রগতিশীল হতে চাইলেন৷ যে অবজেকটিভ কখনও পরিবর্তন করা যায় না বা নাগরিকের মৌলিক অধিকার থেকে 'ব্যক্তি সম্পত্তি ' লুপ্ত করা যায় না সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যখন তা করা হয়েছে এবং ভুয়া সমাজতন্ত্রের রথ যেভাবে এগিয়ে চলেছে আশঙ্কা তাতে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে গণতান্ত্রিক কথাটি মুছে দিতেই বা কতক্ষণ তা হলে সংবিধান বেআইনী সংশোধনের ফলে যে 'স্যোসালিস্ট সেকুলার ডেমক্রেটিক রিপাবলিক ' হয়েছে সেখানে আমাদের সংবিধান সোভিয়েত রাশিয়ার মতো শুধুই 'স্যোসালিস্ট রিপাবলিকে পরিণত হবে৷

সোনার পাথরবাটির এই প্রক্রিয়াই দেশে সমাজতন্ত্রের ছিটে ফোঁটা তো আসেই নি বরং জণসাধারণের পুঁজি কেন্দ্রিভূত হয়েছে ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি পরিবারের মধ্যে৷ সুতরাং সাধারণ মানুষের দুর্দশা যে তিমিরে ছিল তার থেকে বেড়েছে বই কমেনি৷

রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য সংসদে সংবিধান

সংশোধন করলেও এবং বাজারের জন্য ছাপা গ্রন্থে সংবিধানের মূল মূল্যবান ধারাগুলি সংশোধিত করলেও মূল সংবিধান গ্রন্থ এখনও অটুট রয়েছে৷ প্রথম থেকে প্রায় শতাধিক সংশোধনীর একটিও আজ পর্যন্ত মূল সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি৷ অথচ মূল সংবিধানের সঙ্গে অর্ন্তভুক্ত না করেই বেআইনী ও অসাংবিধানিক ভাবে তার প্রয়োগ করে চলেছেন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার তথা রাজনীতিকরা৷

এখানেই শেষ নয়৷ অনেক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে ভারতের সংবিধান রচনার পর সংবিধানগ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত করেছিলেন জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির আদর্শে ও নির্দেশিত পথে তাঁরই স্নেহধন্য নন্দলাল বসু ও তাঁর সহকর্মীগণ৷ ভারতের গণতন্ত্র যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ৫ হাজার বছরের গণতন্ত্রের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সংবিধানের পৃষ্ঠায় নন্দলাল বসু ও তাঁর সহকর্মীদের শিল্পকর্ম দেখেই তা বোঝা যায়৷ ভারতের সংবিধানে অঙ্কিত বাইশটি শিল্প কর্মই সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার বা বেসিক প্ল্যান৷ ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী মামলা ও ২০০৬ সালের চেহেলো বনাম স্টেট অব্ তামিল নাড়ু মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের যথাক্রমে ১৩ ও ৯ জন জজের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছেন কোনভাবেই সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারে হাত দেওয়া যাবে না৷

মূল সংবিধান গ্রন্থে সংশোধনীগুলি সংযোজন বা বিয়োজন না করেই যে সরকার তার প্রয়োগ করছেন সেটা প্রকাশিত হওয়ার পর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কি ব্যবস্থা নেন স◌েটাই এখন দেখার৷

উত্তর সম্পাদকীয়:

ভোট ব্য◌াঙ্কের টানে সংসদকে ব্যবহার - সংবিধানকে অমান্য ,ব◌িচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সরকারের , সংসদ ও বিচার ব্যবস্থার টানাপোড়েনে

ঐতিহ্যবাহী কৃষি-অর্থনীতিই বিপন্ন৷

সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র আনার নেহেরু দাওয়াই ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট নামধারী দলগুলিকে শুধু বিভ্রান্তির মধ্যেই ঠেলে দেয়নি সেই সঙ্গে মেকি বামপন্থি দলগুলির মুখোস খুলতেও কিভাবে সাহায্য করেছিল তা নীচের কয়েকটি পরিবারের জমি অধিগ্রহণের নমুনা দেখলে সহজেই প্রতিয়মান হবে৷ তার আগে আমরা দেখেনিব ভারতের রাজনীতিতে নেহেরু দাওয়াই কিভাবে কার্যকর হয়েছিল৷ মুর্শিদাবাদ সন্দেশের পূর্ববর্তী সংখ্যায় '' সংবিধানের দুই স্তম্ভ - সংসদ ও বিচারব্যবস্থার টানাপোড়েনে গণতন্ত্র বিপন্ন একটি পর্যবেক্ষণ'' প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই যে সংবিধান প্রণয়ণ কমিটি প্রস্তুত হয়েছিল ঐ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি তার সভাগুলিতে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিল যে ভারতবর্ষ হবে ' সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ' রাষ্ট্র৷ কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপ এবং ভারত বর্ষের তৎকালীন বামপন্থিদের ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী সংবিধান প্রণয়ণ

কমিটিতে ক্ষিণকন্ঠে হলেও বারবার উচ্চারিত হওয়া সত্তেও ভারতের সংবিধানের উদ্দেশ্যে (প্রিয়াম্বিলে) বা রুলসে সমাজতন্ত্র শব্দটি একবারের জন্যও উচ্চারিত না হলেও সংবিধান প্রণয়নের ১৫ মাসের মধ্যেই গনতান্ত্রিক এই শিশু রাষ্ট্রটিকে যাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধাক্কা সামলাতে না হয় সেই ভয়ে এবং সমাজতন্ত্র নামক মোহময় অলীক এক রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্ভর যোগ্য ভোটব্যাঙ্ক প্রস্তুতের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র নিয়ে আসার বা নেহেরু প্রস্তাবিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র (সোনার পাথর বাটী) গড়ে তোলার এক অদ্ভুত ফরমূলাকে সামনে এনে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সংবিধান প্রণয়নের ১৫ মাসের মধ্যেই সংবিধানে বাধা থাকা সত্তেও সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে ১৯৫১ সালের ১০ই মে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী এনে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় বা জনগণের মৌলিক অধিকার থেকে আর্টিকেল ৩১ কে বা সম্পত্তির অধিকারকে ম্লান করে দিয়ে আর্টিকেল ৩১ এর পর আর্টিকেল ৩১ক ও আর্টিকেল ৩১ খ সংশোধনী দুটি সংযুক্ত করেছিলেন। ঐ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে সামন্ততন্ত্রের অবসানের জন্য দৃঢ পদক্ষেপ গ্রহন করা। পরবর্তী আলোচনা থেকেই ধরা যাবে শ্রীনেহেরুর ঐ পদক্ষেপটি ছিল কত লোক দেখানো ও ছেলে ভুলানো পদক্ষেপ। কি ছিল সংবিধানের ঐ ৩১ ধারায় ঐ ৩১ ধারার পর কিই বা আনা হলো পরবর্ত্তিতে সম্পত্তির অধিকারকে দায় সারা করে কোথাই নিয়ে যাওয়া হলো আসুন একবার তা দেখে নেওয়া যাক।

ভারতের সংবিধানের ৩য় অধ্যয়ে আর্টিকেল ৩০ ধারার পর মূল সংবিধানে আছে

Right to Property

31. (1) No person shall be deprived of his property save by authority of law

[(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for acquisition or requisitioning of the property for an amount which may be fixed by such law or which may be determined in accordance with such principles and given in such manner as may be specified in such law; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the amount so fixed or determined is not adequate or that the whole or any part of such amount is to be given otherwise than in case :

provided that in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority,

referred to in clause (1) of article 30, the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause.] (2A) Where a law dose not provide for the transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory

acquisition or requisitioning of property, notwithstanding that it deprives any person of his property.]

[(2B) Nothing in sub -clause (f) of clause (1) of article 19 shall affect any such law as is referred to in clause (2).]

(3) No such law as is referred to in clause (2) made by the Legislature of a state shall have effect unless such law., having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

(4) If any Bill pending at the commencement of this Constitution in the Legislature of a State has, after it has been passed by such Legislature, been reserved for the consideration of the President and has received him assent ,then, notwithstanding anything in this constitution, the law so assented to shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2).

(5) Nothing in clause (2) shall affect-

(a) the provisions of any existing law other than a law to which the provisions of clause (6) apply, or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make-

(i) for the purpose of imposing or levying any tax or penalty, or

(ii) for the promotion of public health or the prevention of danger life or property, or (iii) in pursuance of any agrement entered into between the Government of the Dominion of India or the Government of India and the Government of any other country , or otherwise , with respect to property declared by law to be evacuee property.

(6) Any law of the state enacted not more than eighteen months before the commencement of this constitution may within three months form such commencement be submitted to the president for his certification; and thereupon, if the president by public notification so certifies, it shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2) of this article or has contravened the provisions of sub-section (2) of section 299 of the Government of India Act, 1935.

‘‘ সম্পত্তির অধিকার

৩১. (১)

১৯৫১ সালের ১০ই মে সংসদে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী এনে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সংবিধানের ৩১ ধারার পর নিম্ন ধারা দুটি যোগ করলেন।

4. Insertion of new article 31A. - After article 31 of the Constitution, the following article

shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted, namely:-

31A. Saving of laws providing for acquisition of a states, etc.-

(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, no law providing for the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or for the extinguishment or modification of any such rights shall be deemed to be void on the found that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by any provisions of this part.

(2) In this article,-

(a) the expression "estate" shall, in relation to any local area, have the same meaning as in the existing law relating to land tenures in force in that area;

(b) the expression "rights" in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure-holder or other intermediary and any rights on privileges in respect of land revenue."

5. Insertion of new article 31B. - After article 31 A of the Constitution as inserted by section 4 the following article shall be inserted, namely:-

31B. Validation of certain Acts.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part and not withstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said Acts shall continue in force until altered or repealed by a competent Legislature." .....

14. Addition of Ninth Schedule.- After the Eighth Schedule to the Constitution, the following Schedule shall be added, namely:-

"NINTH SCHEDULE"

[Article 31B]

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950).

2. The Bombay Tenancy and Agricultural Act, 1948 (Bombay Act 45 LXVII of 1948).

3. The Bombay Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXI of 1949).

4. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXII of 1949).

5. The Panch Mahals Mehwassi Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXIII of 1949).

6. The bombay Khoti Abolition Act, 1950 (Bombay Act VI of 1950).

7. The Bombay Paragana and Kulkarni Watan Abolition Act, 1950 (Bombay Act LX of 1950).

8. The Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights (Estates, Mahals, Alienated Lands) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act I of 1951).

9. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948).

10. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Amendment Act, 1950 (Madras Act I of 1950).

11. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act I of 1951).

১৯৫১ সালের ১০ই মের পর ১৯৫৫ সালের চতুর্থ সংশোধনী, ১৯৬৪ সালের ১৭ তম সংশোধনী, ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনী ও ১৯৭৮ সালের ৪৪ তম সংশোধনীতে সংবিধানের আর্টিকেল ৩১এ ধারাকে বারবার কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। তবে ১৯৬৪ সালের সংশোধনীতে আর্টিকেল ৩১এ ধারাতে যুক্ত হয় নিম্ন লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ধারা গুলি :

2. In article 31A of the Constitution, -

(i) in clause (1), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof .”

(ii) in clause (2), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely :-

‘(a) the expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include -

(i) any jagir, inam or muafi or other similar grant and in the States of Madras and Kerala, any janmam right ;

(ii) any land held under ryotwari settlement ;

(iii) any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans;'Â

পন্ডিত নেহেরুর সময় থেকেই নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকারকে আস্তে আস্তে খর্ব করা হচ্ছিল । প্রধান মন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধির সময় (১৯৭৮) নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকারকে শুধু মৌলিক অধিকার থেকে সরিয়ে আনাই হলো না সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সংবিধানের পার্ট ১২র অধীন টতুর্থ অধ্যায়ে আর্টিকেল ৩০০এ ধারায় সম্পত্তির অধিকারকে সংযুক্ত করে ঐ অধিকারকে কেবলমাত্র সাংবিধানিক অধিকারে পর্যবসিত করা হলো। ফলতঃ সংবিধানে নাগরিক দের মৌলিক অধিকার বেসিক স্টাকচারের অধ্যয় থেকে সম্পত্তির অধিকারকে সরিয়ে আনার জন্য নাগরিকের সম্পত্তির অধিকারকে চিরতরে বিলুপ্তি ঘটানোর প্রক্রিয়ায় আর বিশেষ একটা বাধা থাকল না।

CHAPTER IV --RIGHT TO PROPERTY

300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law. - No person shall be deprived of his property save by authority of law.

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির অনেকগুলি অধিবেশনে এবং বহু আলোচনার পর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, আইন সম্মত স্বাধীন ব্যাবসার অধিকারের সঙ্গে নাগরিককে তার সম্পত্তি রাখার অধিকারকে মৌলিক অধিকার দিয়েছিল ভারতের সংবিধান । পন্ডিত নেহেরু নাগরিকদের সেই মৌলিক অধিকারকে বিলুপ্তি ঘটাতে যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন নেহেরুজীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী এনে মৌলিক অধিকার থেকে সম্পত্তির অধিকারকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে এনে সম্পত্তির অধিকারকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক অধিকারে পরিণত করলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৮২ সালে বিশ্বম্ভর বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত বলে ছিলেন

– Right not to be deprived of property save by authority of law is no longer a fundamental right, though it is still a constitutional right; Bishamber v. State of Uttar Pradesh, AIR 1982 S C 33. এই প্রসঙ্গে ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট আরও পরিস্কার করে বল্লেন – After the Constitution (Forty - fourth Amendments) Act, 1978 the right to property is only constitutional right. It is not a part of the basic structure. M.K. Kachar v. State of Gujarat, J T (1994) 4 S C 473. (চলবে)

সুধীরকুমার মিত্র – জন্ম - শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

(বহরমপুর , গত ১৭ জানুয়ারী ২০০৭ ঃ এদিন বিকালে ইতিহাস পরিক্রমার প্রসস্থ পাঠগৃহে অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হুগলি জেলার ইতিহাস প্রণেতা সুধীর কুমার মিত্র জন্ম শতবর্ষ সস্মরণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলার লোক সাহিত্য বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষক শ্রী পুলকেন্দু সিংহ মহাশয়। সিংহ মহাশয় সুধীর কুমার মিত্রের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে ও হেরিটেজ ল্যাম্প প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সুধীর কুমার মিত্র স্মারক বত্তৃণতা দেন যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চিত্ত ব্রত পালিত। সভার সঞ্চালক ছিলেন ইতিহাস পরিক্রমার কর্ণধার শ্যামল দাস। উপস্থিত ছিলেন দেবব্রত মল্লিক, সুধীর কুমার মিত্রের পুত্র পল্লব মিত্র, অধ্যাপক সুনীল দাস সহ বহু সুধিজন। ঐ সভায় সুধীর কুমার মিত্রের স্মৃতি বিজড়িত সবকিছুই সঠিক ও আইনানুগ ভাবে সংরক্ষণের প্রস্তাব নেওয়া হয়। নানা রূপ অসুবিধায় সংবাদ ও প্রস্তাবটি প্রকাশ করা যায়নি। এক্ষণে তা প্রকাশ করা হলো)

পিতার নাম ছিল আশুতোষ মিত্র, মাতার নাম রাধারাণী দেবী। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক। চাকরী করতেন হাওড়ার ব্রিজ নির্মাতা এ জে মেন কোম্পানীতে। আশুতোষ মিত্রের পিতার নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিত্র। বিশ্বম্ভর মিত্রের জমিজমা ছিল হুগলী জেলার জেজুর গ্রামে। অধুনা লুপ্ত সুধাকর (উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের) পত্রিকার সম্পাদক ও কবি রাধামাধব মিত্রের বংশধর ছিলেন বিশ্বম্ভর। মাতা রাধারানী ছিলেন বিখ্যাত হুতুম প্যাঁচার নক্সা লেখক প্রখ্যাত কালিপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কালিপ্রসন্নের আদি বাড়ি ছিল হুগলী জেলার জনাই বকসা গ্রামে।

সেখানেই মাতুলালয়ে জন্ম নেন সুধীর কুমার মিত্র ১৯০৯ সালের ৫ জানুয়ারী। বিশ্বম্ভর মিত্রের বাড়ী ছিল কলকাতার মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে। ১৯২৯ সালে সেন্ড্রাল এভিনিউ সংস্কার কালে ঐ বাড়ীটি ভাঙা পড়ে। ফলে আশুতোষ বাবু ঐবছরই কেনেন কালিঘাটের কাছে ২নং কালি লেনের বাস বাড়িটি। বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভটা কাটে মসজিদ বাড়ী স্ট্রিটের বাড়ীতে জীবনের বাকী অংশটা কেটেছে ২ নং কালি লেনের স্বল্প পরিসর বাস বাড়ীতে। আশুতোষের একমাত্র পুত্র সুধীর কুমার ১৯১৮ সালে ভর্তি হন স্কিশ চার্চ কলেজিয়েট সুক্লে। ১৯২৬ সালে পাশ করেন এনট্রান্স। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকেই হন বিজ্ঞানে স্নাতক। বাল্য ও কৈশোর নগর কলকাতায় কাটলেও পৈত্রিক মফস্বল জীবনের সঙ্গে যে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়নি তা বোঝা যায় ১৯৩৫ সালে সুধীর কুমার লিখেন

'জজুরের মিত্র বংশ' নামে তাঁদেরই পারিবারিক ইতিহাস। এটিই সুধীর কুমারের আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার প্রথম হাতে খড়ি। সমকালে সুধীর কুমার থাকতেন কালি লেনে। কালিঘাট মাতৃ মন্দিরের সন্নিকটেই। কালিঘাট মাতৃমন্দিরে তখন নিম্নবর্গের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি ব্রাহ্মণেতর কোন সম্প্রদায়ের বসবাসেরও অধিকার ছিল না ঐ মন্দিরের সন্নিকটে। ট্র্যাডিশনটা প্রথম ভেঙেছিলেন আশুতোষ মিত্র ১৯২৯ সালে ঐ এলাকায় বাসবাড়ী কিনে। পুত্র সুধীর কুমার মিত্র জাতপাতের বিচারের ট্র্যাডিশন ভাঙার আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে মাতৃমন্দিরে নিম্ন বর্গের প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৩২ - ৩৩ সালে উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতপাতের বেড়া উৎপাটনের জনচেতনা বাড়াতে হরিজনদের নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের। লেখা চেয়ে চিঠি পাঠান গান্ধিজীকে। গান্ধিজী তখন ওয়ার্ধা জেলে বন্দি। ওয়ার্ধা জেল থেকেই গান্ধিজী ১৯৩৩ সালের ১৪ এপ্রিল সুধীর কুমারকে লেখেন ''আজ দেশের যা অবস্থা এই মুহূর্তে হরিজনদের নিয়ে আন্দোলন না করাই ভাল। তাই ঐ বিষয়ে প্রকাশিতব্য কোনও পত্রিকায় আমার লেখা সম্ভব নয়। '' এই পত্রের দু বছরের মধ্যেই গান্ধিজী 'হরিজন' পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। বলা যেতেই পারে 'হরিজন' পত্রিকা নিয়ে গান্ধিজীর চিন্তার উন্মেষের অন্যতম উৎস ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে হরিজনদের নিয়ে পত্রিকায় লেখা চেয়ে গান্ধিজীকে সুধীর কুমারের অনুরোধ পত্র।

১৮৭০ -৮০ সালে ডবলিউ ডবলিউ হান্টার প্রকাশ করেন স্ট্যাটিশটিক্যাল একাউন্টস্ অব বেঙ্গল। তারই সূত্র ধরে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৯০২-০৫ সালে ওমেলি প্রকাশ করেন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার। গেজেটিয়ারের মাধ্যমে প্রশাসকেরা জানতেন দেশের নদী নালা পথঘাট ভূপ্রকৃতি ব্যবসা বাণিজ্য বিচার ও রাজনৈতিক ইতিহাস। কিন্তু দেশের প্রকৃত ইতিহাস সেখানে থাকত অনুপস্থিত। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন আমাদের প্রকৃত ইতিহাস নেই। বঙ্কিমের দুঃখ মোচন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আঞ্চলিক ইতিহাসই যে দেশের বৃহত্তম ইতিহাসের উৎস সে উপলব্ধি এনে দেন রমাপ্রসাদ চন্দ (গৌড় রাজমালা ১৯১২), রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙ্গালার ইতিহাস ১৯০৯), প্রমুখ ইতিহাসবিদ্। এরও আগে

রেভারেন্ড লালবিহারী দে লেখেন ‘ব্যাঙ্কারস্ কাস্ট অব বেঙ্গল’ ও ‘বেঙ্গল পিসেন্ট লাইফ’ এবং ‘গোবিন্দ সামন্ত দি হিস্ট্রি অব এ বেঙ্গল রায়ত’ (১৮৭৪)। বাংলার সামাজিক ইতিহাস লেখা সেদিনই বোধ হয় শুরু। এঁদের কর্মধারার পথ বেয়েই ‘হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ’ লিখতে ব্রতী হয়ে সুধীর কুমার মিত্র ঐ জেলার আঠারোশো গ্রাম ঘুরে ঘুরে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে এগারোশো পৃষ্ঠার এক বৃহৎ মহাভারত সমীপ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই মৌলিক কাজে মুগ্ধ হয়েছিলেন আচার্য সুনীতি কুমারও। বাংলার কোন জেলার এত বিশ্লেষণী সুসংবদ্ধ ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রথম। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ বা নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের পরামর্শে দক্ষিণ কলকাতায় তিনটি বিদ্যালয় ও একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনও সুধীরকুমারের অক্ষয় কীর্তি। শুধু ‘হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ’ গ্রন্থই নয় সুধীরকুমার লিখেছেন ‘হুগলী জেলার দেব দেউল’ ‘দক্ষিণের দেবস্থান’ ‘ সোসাইটি কালচার অ্যান্ড রিলিজিয়ন অফ বেঙ্গল’ ‘ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল ল্যাঙ্গুয়েজ’ প্রভৃতি ৪০ টি গবেষণামূলক গ্রন্থ।

এ হেন বাংলায় আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশ্বকোষ সদৃশ ইতিহাসবিদ্ সুধীরকুমার মিত্রের জন্ম শতবর্ষে এই সভার শ্রদ্ধার্ঘ তাঁকে শুধু স্মরণের মধ্যে দিয়েই নয় তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সবকিছুই সঠিক ও আইনানুগ ভাবে সংরক্ষণের প্রস্তাবের মধ্য দিয়েও।

শতবর্ষ পেরিয়েও অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় প্রাসঙ্গিক

ডঃ চিত্তব্রত পালিত,

প্রকৃত প্রস্তাবে কলকাতা মহানগরীর পৌরপিতা অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যাক্তিত্ব। সন ১৯১০, ৯ই নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ শহরে অধ্যাপক রায়ের জন্ম হয়। তিনি সেখানকার বিশ্বেশ্বরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপরে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তারপর প্রথমে বিদ্যাসাগর ও পরে সেন্ট পলস্ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে সেন্ট পলস্ কলেজ থেকে তিনি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ . পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন।

অধ্যাপক রায় শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজে অধ্যাপক হিসাবে। পরের বছর কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ও পরে সেন্ট পলস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আংশিক সময়ের অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৭১ সালে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সেক্রেটারী ও কিউরেটর পদে মনোনীত হন এবং ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপরে তিনি কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ এর অধিকর্তা হন এবং ১৯৯৪ সালে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই পদে বৃত ছিলেন।

তিনি ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ এর পক্ষে Dictionary of

National Biography Suppliment এব vol. I এবংII সম্পাদনা করেন। এছাড়া তিনি কলকাতার উপর বেশ কিছু বই লিখেছেন, যেমন Calcutta—A profile of a city, city of Job Charnak, A Street Side Story, কলকাতার ইতিহাসের উপাদান, প্রসঙ্গ কলকাতা এবংThe Bengal Nawbabs প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও তিনিCentenary History of Indian National Congress vol I এবংThe Hundred years of Freedom Struggle (1847 - 1947) সম্পাদনা করেন।

অধ্যাপক রায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল বহুধা বিস্তৃত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal পাবলিকেশন কমিটির সম্পাদক ছিলেন।Calcutta Historical Society-র ও সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ইতিহাস পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এব Calcutta Tercentenary Committee- র সহ সভাপতি এবং মুখ্য উপদেষ্টাও ছিলেন। উপরোন্ত West Bengal State Archives এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং বাংলা একাদেমীরও সভাপতি ছিলেন।

এ সমস্ত পোষাকী পরিচয়ের ঊর্ধে অধ্যাপক রায়ের মুখ্য পরিচয় হল তিনি একজন একান্ত ছাত্র বৎসল শিক্ষক, বর্তমান লেখকও তাঁর ছাত্র এবং তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়ে ধন্য। কোন কিছু আবেদন নিয়ে কোন ছাত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তার ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ে আমারও অভিজ্ঞতার ঝুলি সামান্য নয়।

বৃহত্তর কর্মজগতে অধ্যাপক রায় ছিলেন একজন মহাসংগঠক। তিনি Calcutta Historical Society, Victoria Memorial Hall, Institute of Historical Studies এবংCalcutta Society for Preservation- এর প্রধান স্থপতি। একারণে তাঁর স্মৃতি আজও অম্লান।

গবেষক হিসাবেও তিনি স্বনামধন্য ছিলেন তিনি, ছিলেন একান্তই কলকাতা প্রেমিক। কলকাতার Citizen Tompayne কলকাতা সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিসা ছিল তীব্র। তিনি নিজে শুধু উপরি উল্লিখিত বইগুলি লিখে ক্ষান্ত হননি, কলকাতার ঐতিহাসিক P.T. Nair কেও তিনি সেই অনুসন্ধানেও নিমগ্ন রেখেছেন। কলকাতা সম্পর্কে স্বদেশী বিদেশী কেউ কিছু জানতে চাইলে তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। তিনি ছিলেন কলকাতা সম্পর্কে তথ্যের আকর। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতাবাসী পিতৃবিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিল। শতবর্ষের আলোকে আজও তিনি দেদীপ্যমান। জন্ম শতবর্ষে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

মতিলাল শীল

॥ এক॥

১৭৬৩ সাল থেকে ১৭৯৩ ইউরোপের ইতিহাসে দোলাচলতার যুগ। বিপ্লব ও পরিবর্তনের যুগ। ১৭৬৩ সালে ইউরোপে ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আত্মনিয়োগ করল দেশ পুনর্গঠনে। সপ্ত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের যবনিকা টানতে ফ্রান্সকে মূল্য দিতে হলো অনেক। পৃথিবীর বহু জায়গার সঙ্গে ভারতে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ণ তাদের ভেঙ্গে গেল এক ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে। ভারতবর্ষের বাংলাদেশের রাজন্যবর্গ তখন ইংরেজদের তুষ্ট করতে ব্যস্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেকটর হয়ে ক্লাইভ পুনরায় এলেন ভারতে। ক্লাইভের প্রাক্তন উর্দু ও পার্শী শিক্ষক নবকৃষ্ণদেবের পরামর্শে ক্লাইভ দিল্লি গেলেন শাহ আলমের কাছে। দেওয়ানীর জন্য দরবার করতে। বলাই বাহুল্য নবকৃষ্ণও ক্লাইভের সঙ্গে ছিলেন। শাহ আলম তখন রাজ্যহারা সিংহাসন হারা। ক্লাইভ বছরে মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানীর আইনানুগ ক্ষমতা নিলেন শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানীর জন্য। এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকে ইতালির নবজাগরণের চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছে ফ্রান্সের চিন্তা ও চেতনার তটে। শুধু ফ্রান্সেই নয় নবজাগরণের চিন্তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের সর্বত্র। স্পেন, পর্তুগাল, প্রাসিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড যে দেশগুলো এতোদিন বাণিজ্য পুঁজির

উপর নির্ভর করতো তারা দেশের অভ্যন্তরে সম্পদ জমা করেছে বিস্তর। রাজা ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে এই গড়ে ওঠা ব্যক্তি পুঁজির লোকের মিলছে না একেবারেই। রাজতন্ত্র তার এতদিনের আভিজাত্য ও স্বাধীনতা গড়ে ওঠা পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। পুঁজিবাদ বারবার প্রতিহত হচ্ছে রাজার কাছে- রাজতন্ত্রের কাছে। অন্য দিকে পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে ক্ষমতাকেও করায়ত্ত করতে চাইছে পুঁজিপতি শ্রেণী। এর জন্য চাই জনগণের সমর্থন। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগেও একদিন প্রয়োজন জন সমর্থনের। সেদিনও রাজা ও রাজতন্ত্রের সমর্থনে তৈরী হয়েছিল দর্শন, সাহিত্য চিন্তা ও সঙ্গীত। মধ্যযুগ থেকে যে রাজতন্ত্র শুধু ক্ষমতার জোরে নয় তার সমর্থনে দার্শনিক মতবাদ তৈরী করে নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থে তৈরী করা হাজার কুসংস্কারের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল জনগণের হাতে ও পায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে গড়ে ওঠা পুঁজিপতিদেরকে শুধু রাজতন্ত্রের বাধা অপসারণ করে পুঁজিবাদ কায়েম করবার জন্য লড়াই করলেই চলেনি তাদেরকে পুঁজিবাদের সমর্থনে দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে লড়াই করতে হয়েছে সমস্ত রকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

ইউরোপে রেনেসাঁ একদিনে গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেনি ব্যক্তিগত পুঁজি ও সম্পদ একদিনে। পুঁজির বিকাশের দিনে তার সমর্থনে পুঁজিবাদের উপর গড়ে ওঠা দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক আগেই। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে রেনেসাঁর আগমনের সুরের মুর্চ্ছনা শোনা যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ষোড়শ শতাব্দী থেকে স্পেন্সার, বেকন, মেকিয়াভেলি, মাইকেল এঞ্জেলো, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও প্রত্যেকেই তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের চিন্তা ও চেতনাকে আঘাত করে এসেছেন। চিন্তার এই বিকাশ একদিন ফরাসী দেশে জনসাধারণের মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের রূপ নিয়ে ফেটে পড়ল। সেটা ১৬৯৩ সাল। বিপ্লবের চিন্তা দর্শনগত ভিত্তি তৈরী হল রুশো ভলটেয়ার প্রভৃতি রেনেসাঁর চিন্তা নায়কদের চিন্তায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে চলেছিল রেনেসাঁর প্রস্তুতি।

এদিকে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কিন্তু অন্যরকম। ইউরোপে যখন রেনেসাঁর উন্মেষ হয় ভারতে তখন মধ্যযুগ অস্ত যায়নি। ইতিমধ্যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথমে পর্তুগীজরা তারপর একে একে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীরা এদেশে এসেছে বাণিজ্য করতে। ইউরোপের ঐ দেশগুলি থেকে যারা এসেছে তারা নিয়ে এসেছে বাণিজ্য পুঁজির সম্ভার। প্রথম অবস্থায় কাঁচামাল এদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করে শিল্প পুঁজির বিকাশের পদ্ধতি ছিল না। ছিল শুধু এদেশীয় পণ্য ও দেশে নিয়ে যাওয়া এবং দেশীয় পণ্য নিয়ে এসে এদেশে বিক্রি করবার পদ্ধতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে শিল্প পুঁজির জন্মের সাথে সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হল তার ঢেউ এদেশেও এসে পঁৌছাল। কিন্তু ভারতে তখনও মধ্যযুগ। এই শতাব্দীরই মাঝামাঝি মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ এর সবথেকে দুর্বলতম জায়গা বাংলার মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের অভীপ্সা অনুপ্রবেশ করেছে। বাংলার রাজন্যবর্গকে হাত করে বাংলার সিপাহসালার মীরজাফর আলি খাঁকে

সিংহাসনে বসিয়েছে ইংরেজরা ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদৌলাকে হারিয়ে দিয়ে। পলাশীর যুদ্ধে ৬ বছর পর ইউরোপে হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের সন্ধি। সন্ধির শর্তমত একমাত্র চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র বাণিজ্য কুঠি গুটিয়ে নিতে হয়েছে ফরাসীদেরকে। এদেশে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ণও তাদের উবে গেছে চিরদিনের জন্য।

ইতিমধ্যে ১৭৬৩ সালে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর হয়ে এলে ক্লাইভেরই প্রাক্তন উর্দু ও পার্শী শিক্ষক মুন্সী রাজা নবকৃষ্ণদেবের পরামর্শে ক্লাইভ দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে কিনেছিলেন বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা খাজনা দেবার করারে বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানী। এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হল। ১৭৬০ সালের ২৪শে আগষ্ট ত্রিবেণীর বণিক রাজারাম মল্লিকের পরামর্শে জব চার্নক যেদিন সুতানুটির ঘাটে নোঙর করেছিলেন সেদিন জব চার্নক তো বটেই এমনকি লন্ডন কোম্পানীর কেউই ভাবতে পারেন নি এদেশে বাণিজ্য করতে করতে মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে কোম্পানী এদেশের দেওয়ানী ইজারা নিয়ে প্রজা শাসন করতে বসবে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক যেদিন কলকাতায় এসেছিলেন সুতানুটিতে বড় সুতোর হাট ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। সুতানুটির দক্ষিণে কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট উত্তরে বড়বাজার। আর এখন যেখানে শহীদ মিনার সেখানে শেঠ বসাকদের বিরাট তাঁতের কারখানা। চার্নক সুতানুটিতে এসে বছর দুয়েক কাটাতে না কাটাতেই মারা গেলেন। কোম্পানীর গভর্নর হলেন চার্নকের জামাই চার্লস। ১৬৯৮ সালে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কলকাতায় জমিদারী কিনে নিলেন লন্ডন কোম্পানী মাত্র ১৩,০০০ হাজার টাকায় সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে। এরপরই চার্লস কলকাতায় দুর্গ বানালেন ইংলন্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে এখন যেখানে জি. পি. ও সেখানে। প্রথমে ইংরেজদের কলকাতার জমিদারীর পরিমাণ ছিল মাত্র ১০২ একর জায়গা। মাত্র ১০২ একর হলে কি হবে তবুও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই কলকাতা কাউন্সিলকে প্রেসিডেন্সি হিসাবে ঘোষণা করেছে কোম্পানী।

১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী কিনে নিয়ে কোম্পানী আস্তে আস্তে এদেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিল। বাণিজ্য কুঠিতো আগেই ছিল সেই সঙ্গে খাজনা আদায়ের কাছারী স্থাপন হল দেশের সর্বত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলন্ড থেকে যে সকল ইংরেজরা এদেশে আসতেন তাদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপ থেকে হয়ে এসেছেন রেনেসাঁর ভাবধারায় স্নাত। মধ্যযুগীয় পরিবেশে এদেশেও রাজ্য ও রাজন্যবর্গের পাশাপাশি বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে একটু একটু করে এদেশেও জন্ম হচ্ছে রেনেসাঁর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এদেশেও শুরু হয়ে গিয়েছে রেনেসাঁর চিন্তায় চিন্তিত মানুষের জন্ম। ১৭৭০ থেকে ১৮২০ এদেশের ইতিহাসে এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস রেনেসাঁর জন্মের ইতিহাস। ঠিক এর আগে পঞ্চাশ বছরে এদেশে ঘটে গিয়েছে হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তপাত, দ্বেষ হিংসা আর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। পরের পঞ্চাশ বছরে রত্ন প্রসবিনী বাংলা জন্ম দিয়েছে তাজা একগুচ্ছ নবজাগরণের কর্মীর। এদের শুরু রামমোহনে ১৭৭২ সালে আর এর

পূর্ণতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে ১৮২০ সালে। ১৭৭০ থেকে ১৮২০ বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগ। এই সময় যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের চিন্তাও চেতনা কর্ম ও ধারণা সমৃদ্ধ হয়েছে আগের পঞ্চাশ বছরের চিন্তা ও চেতনা যা রামমোহনের চিন্তা ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে শুরু হয়েছে রেনেসাঁর প্রক্রিয়া বিদ্যাসাগরে এসে তা পরিণতি পেয়েছে। এ যেন নবজাগরণের চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ হওয়ার পঞ্চাশ বছরের যুগের দুই মাইলস্টোন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এই দুই মাইলস্টোনের মাঝে আরও কত মাইলস্টোন আছে যাদেরকে না চিনলে বা না জানলে ভারতীয় রেনেসাঁর দুই স্তম্ভকে ভালভাবে চেনা যাবে না পরিমাপ করা যাবে না রেনেসাঁর পরিমিতি। ভারতীয় নবজাগরণের প্রক্রিয়ায় এই দুই বিরাট স্তম্ভের মাঝে যে থামগুলি আছে বড় বড় স্তম্ভগুলিকে দেখলে হয়তো সেগুলো চোখে পড়ে না কিন্তু ঐ স্তম্ভগুলিকে বাদ দিলেও তো আর রেনেসাঁর ক্রম পরিক্রমা থাকে না। একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তিনের পর চার এমনিভাবেই ক্রমে একশো। দুই না থাকলে তিনকে চেনা যাবে না আর নব্বই বা নিরানব্বই না থাকলে একশোকে উপলব্ধি করা যাবে না। তাই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর প্রায় অর্ধশতাব্দীর এই পরিক্রমায় আরও যারা এসেছেন সমৃদ্ধ করেছেন এদেশের রেনেসাঁকে ধুলায় আচ্ছাদিত, বিস্মৃতির অতল তল থেকে তাদেরকে তুলে আনা প্রয়োজন। ধুলা সরিয়ে বিস্মৃতি মুছে তাদের সঠিক অবস্থিতি নির্ধারণ করলেই সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হবেন এদেশের নবজাগরণের উদগাতারা। তা না হলে আবেগ আর উচ্ছ্বাসের বশে আমরা মনীষীর মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে পারব না। যে মনীষী যা নন তাকে আমরা সেই আসনে বসাব যিনি যা করেন নি তাঁকে তার প্রচলক হিসাবে চালাতে চেষ্টা করব। যিনি যা করেছেন তাকে সে সম্মান না দিয়ে অসম্মান করব। এতে মনীষীর সম্মান বাড়ার বদলে কমবে। বরং ইতিহাসের নিরিখে যে যা করেছেন যার যতটুকু প্রাপ্য সেই সম্মান দেওয়া হবে যথার্থতা। এতে আমাদের যেমন সেই মনীষীর প্রতি যথার্থ সম্মান জানান হবে নিজেদেরকেও আমরা সম্মানিত করব ততটুকুই। ভারতের রেনেসাঁ গড়ে ওঠার যুগে পঞ্চাশ বছরে রাজা রামমোহনের জন্মের মধ্যে দিয়ে যেমন রেনেসাঁর যুগে মনীষীদের জন্মের সূচনা হয়েছিল তেমনি ঐ পঞ্চাশ বছরে জন্মেছেন একে একে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ অসংখ্য চিন্তাশীল ও কর্মঠ মানুষ। যাদের চিন্তা ও চেতনা সমৃদ্ধ করেছে রেনেসাঁর দুই স্তম্ভ- রামমোহন আর বিদ্যাসাগরকে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ব্যক্তি চিন্তা যেমন সমষ্টি গত চিন্তায় সংকলিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সমষ্টির চিন্তা তেমনি ব্যক্তি চিন্তার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধির রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

মতিলাল শীল এমনই এক মাইলস্টোন যার অবস্থিতি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে। জন্মস্থানের দূরত্ব এদের খুব বেশী নয়। কিন্তু কর্মস্থান একই জায়গায় কলকাতায়।

রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭২ সালে খানাকুল কৃষ্ণনগরের রাধানগর গ্রামে। কেউ

বলেন ১৭৭২ নয় রামমোহনের জন্ম ১৭৭৬ এ। বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্ত ১৭৭৪ সালে রামমোহনের জন্ম। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে তাঁর জন্মের ব্যাপারে দ্বিমত নেই কিন্তু মতিলাল শীলের জন্ম ১৭৯১ বা ১৭৯২ এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিমত আছে। কিশোরী চাঁদ মিত্র সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁর জন্ম ১৭৯২ সালে। শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রীর মতে তাঁর জন্ম সাল ১৭৯১। ইংরাজী সাল নিয়ে দ্বিমত থাকলেও বাংলা সাল নিয়ে কারো দ্বিমত নাই। সকলেই একমত যে মতিলাল শীল বাংলা ১১৯৮ সালে জন্মলাভ করেছিলেন। বাংলা সালের নিয়মই এই সে এক বছরে দুটি ইংরাজী সালকে স্পর্শ করে। আবার দুটি ইংরাজী সালের মধ্যে বাংলা সালের অবস্থিতি আগের বছরের ১৫ই এপ্রিল থেকে পরের বছরে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত। অতএব বলা যায় মতিলাল শীল ১৭৯১ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৭৯২ সালের ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে জন্মেছিলেন। অর্থাৎ ঐ ১১৯৮ সালের যে কোন সময় তাঁর জন্ম। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জন্মকালের ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ বছরের হলেও জন্মস্থানের ব্যবধান বেশী নয় মাত্র ২১ কিলোমিটারের মত। রামমোহনের জন্ম হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে আর বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামে। মেদিনীপুর হুগলী ও কলিকাতা তিনটিই পাশাপাশি স্থান মতিলাল শীলের জন্ম এই কলকাতায় হুগলী ও মেদিনীপুরের অনতিদূরে। পূর্বে ভারতের এই তিন জেলাতেই ছিল তিনটি বিখ্যাত বন্দর। তাম্রলিপ্ত, হুগলী আর কলকাতা। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন পুরাতন বন্দর তাম্রলিপ্ত যে জেলায় অবস্থিত ছিল সেই মেদিনীপুরে আর হুগলী জেলার হুগলী বন্দর যেখানে অবস্থিত ছিল তার অনতিদূরে জন্মলাভ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আর সবশেষে আধুনিক বন্দর কলকাতা সেখানে জন্ম হয়েছিল মতিলাল শীলের। তিন জেলায় নবজাগরণের তিন স্তম্ভের জন্ম হলে কি হবে এদের কর্মক্ষেত্র ছিল ঐ আধুনিক শহর ও বন্দর কলকাতায়। রামমোহন ১৭৭২ সালে জন্মলাভ করে ১৮১৪ সালে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন আর বিদ্যাসাগর ঠিক এর ছয় বছর পর বীরসিংহ গ্রামে জন্মলাভ করে মাত্র ৭ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮২৭ সালে কলকাতায় এসে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে ১৭৯১/১৭৯২ সালে বা ১১৯৮ বঙ্গাব্দে কলকাতার কলুটোলায় মতিলাল শীলের জন্ম হয়েছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৬৯ সালে লিখেছেন মতিলাল শীলের জন্ম হয়েছিল ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১১৯৮ সালে তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটা কলুটোলা কলকাতায়।

॥ দুই॥

হ্যাঁ এই সেই কলকাতা। কল্লোলিনী তিনশো বছর অতিক্রমকারী কলকাতা। ভারতবর্ষের নবজাগরণের লীলাভূমি। ১৬৯০ সালে জব চার্নক এর মাটিতে পা রেখে সূচনা করেছিলেন আধুনিক কলকাতার। তখনও মধ্যযুগের অমানিশার অন্ধকার এদেশ থেকে কেটে গিয়ে সূর্যোদয় হয় নি। অন্ধকারের গভীরতা একটু একটু করে কেটে গিয়ে এক সময় আকাশ ফর্সা হতে থাকে। মধ্যরাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফিকে হতে হতে একসময় কাকভোরের অবসানে মৃদু আলোয় ফোটে সূর্য্যালোক, তাকে দেখা দিতে সময় লাগে আরও অনেকক্ষণ। ১৬৯০ সালেই প্রথম মধ্যযুগ অতিক্রম করল

কালবেলা। সময়টাতে আধুনিক যুগের সূচনা বলা যায়। আর এই সূচনার বীজ উপ্ত হল কলকাতায়।

প্রশ্ণ থেকে যায় তা হলে ১৬৯০ সালের আগে কি কলকাতা ছিল না চার্নকই কি স্থান নির্বাচন করে নামকরণ করলেন। অতিউৎসাহী কেউ কেউ তা বললেও পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করেন না। মহামতি আকবর সিংহাসনে বসেছিলেন ১৪৬৬ শকে ইংরাজী ১৫৪৪ সালে। আকবরের সিংহাসন আরোহনের বারো বছর আগে রচিত হয়েছিল যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্তের কথোপকথনে কলকাতার উল্লেখ আছে। কলকাতার উল্লেখ আছে ১৫৯৬ সালে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী নামক প্রামাণিক গ্রন্থে। সুতরাং কলকাকাতর প্রাচীনত্ব তিনশো বছরের নয়। কলকাতার প্রাচীনত্ব সাড়ে চারশ বছরেরও বেশি। আর জব চার্নক কলকাতায় সব থেকে প্রথমে আসেন নি বা এসেও ব্যবসা বাণিজ্যের পত্তন করেন নি। জব চার্নকের বহু আগে দেশীয় লোকেরাই কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ ও বসাকদের পূর্বপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ ও কালিদাস বসাক মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার থেকে ব্যবসা করতে এসেছিলেন কালীক্ষেত্র বা কালীঘাটে। এরাই কলকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করে পত্তন করেছিলেন গ্রাম কলকাতার। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সুতানুটিতে বসত সুতোর হাট। মুর্শিদাবাদের আগে বসাকরা থাকতেন রাজমহলে। এই বসাকরাই সরবরাহ করতেন মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরের শিল্পখচিত বস্ত্র। মোগল সম্রাটরাই দেয় এদেরকে বুশাখ বা বসাক উপাধি। বুশাখ কথাটি পার্শী শব্দ। বু মানে সৌরভ শাখ মানে শাখা অর্থাৎ মোগল সম্রাটের শিল্প ও সৌন্দর্যকলার শাখা তারা। বস্ত্রবয়ন ছিল এই শেঠ বসাকদের জীবিকা। সম্রাট আকবরের সময় থেকে তারা বস্ত্র বয়ন ছেড়ে দিয়ে বস্ত্র ব্যবসা করে। কালিদাস বসাকই প্রথম গোবিন্দপুরে উদ্যোগ নিয়ে জনবসতি স্থাপন করেছিলেন। বস্ত্র ব্যবসা ছাড়াও কালিদাস বসাকের ছিল কাঠের সিন্দুকের ব্যবসা। নবাব জমিদাররা এই কাঠের সিন্দুক কিনে তাতে রাখতেন হীরে মুক্তো ও জহরৎ। সে সময় অব্দি ইউরোপীয় কোন বণিক কলকাতায় পদার্পণ করেন নি।

ইউরোপীয় বণিককুল এদেশে আসতে আরম্ভ করে ১৫০০ সাল থেকে। ১৪৭৩ সাল নাগাদ মধ্যযুগের অবসানের কালে ইউরোপীয়রা খুঁজতে থাকে ভারতে আসার পথ। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা বন্ধ করে দিয়েছে এশিয়া থেকে ইউরোপে জলপথে যাবার রাস্তা। ফলে ভারতের মশলা, মসলিন ও সোরা ইউরোপের বাজার থেকে হয়েছে অন্তর্হিত। ১৪৫৩ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে ইউরোপের বাজার ছিল অন্ধকারময়। ভারতের পণ্য সামগ্রীর ইউরোপের বাজারে চাহিদা থাকলেও ছিল না কোন যোগান। ভারতীয় দ্রব্যের অফুরন্ত চাহিদা থাকলেও এর যোগান না থাকায় ইউরোপের বণিকেরা নতুন করে খুঁজতে লাগলেন ভারতে আসার নতুন পথ। লোহিত সাগরের কিনারায় পাহারা দিচ্ছে তুর্কীরা। স্পেন থেকে ভারতের উদ্দেশে বেরিয়ে ইটালীর নাবিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস গিয়ে পৌঁছালেন দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে। ভুল করে সে দেশের লাল মানুষের নাম রাখলেন রেড ইন্ডিয়ান। ভুল ধরা পড়লে

পর্তুগালের দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ সালে এসে পৌঁছালেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে। আফ্রিকার দক্ষিণ সীমানা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নতুন জলপথে।

পর্তুগীজরাই ভারতে আগত ইউরোপের প্রথম বণিক। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশটি জাহাজ ও হাজার খানেক সৈন্য নিয়ে ভারতের কালিকট ও কোচিন বন্দরে এসে ব্যবসা করতে শুরু করলেও পর্তুগীজরা ভারতের ভূখণ্ড দখল করে আরও অনেক পরে। ১৫১০ সালে গোয়া চলে যায় পর্তুগীজদের হাতে।

ভারতে পর্তুগালের একচেটিয়া বাণিজ্যে প্রথম আঘাত হানে নেদারল্যাণ্ড। পর্তুগীজরা প্রায় বিনা বাধায় একশো বছর ধরে ভারতে একচেটিয়া ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার পর নেদারল্যান্ডের অধিবাসী ওলন্দাজরা ১৬০২ সালে ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতে পাড়ি জমায়। ১৬০৫ সালে ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে দখল করে নেয় গোয়া ও শ্রীলঙ্কা। গুজরাট ও ভারতের দক্ষিণ উপকূলের ব্যবসা প্রলুব্ধ করে ওলন্দাজদের। ওলন্দাজরা একের পর এক সুরাট, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় কুঠি স্থাপন করে। ভারতের করমণ্ডল অঞ্চলে প্রথমে পর্তুগীজ ও তারপর ওলন্দাজদের ব্যবসা বাণিজ্য দেখে ইংরেজ বণিকেরা হন প্রলুব্ধ। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে (২২শে সেপ্টেম্বর) ইংলান্ডে পত্তন হয় দি গভর্নর এণ্ড কোম্পানী অব মার্চেন্টস অব লণ্ডন ট্রেডিং ইনটু দি ইস্ট ইণ্ডিজ। সংক্ষেপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তখন ভারতে আকবরের রাজত্বকাল। আকবরের রাজসভায় পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের ছিল ভীষণ রকম প্রতিপত্তি। আকবর যতদিন বেঁচেছিলেন ইংরেজরা ততদিন এদেশে বাণিজ্য করবার সুবিধা করতে পারেন নি। বিলাসী সম্রাট

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০৮ সালে ইংরেজরা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বাণিজ্য করবার প্রথম অনুমতি পান সুরাটে। এই অনুমতিও বেশিদিন টেকেনি। অল্পদিনের মধ্যে প্রত্যাহিত হয় সম্রাটের সেই সনদ। ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার টমাস রো ১৬১৫ সালে পুনরায় জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে রিনিউ করে নেন পশ্চিম ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি। সুযোগ সন্ধানী ইংরেজরা পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠা করে বন্দর ও দুর্গ। রমরমিয়ে চলে ইংরেজদের ব্যবসা। ভারতের নীল সোরা চিনি মসলিন ও মশলা ইংরেজদের মাধ্যমে যোগান পায় গোটা ইউরোপ। বোম্বাই তখন পর্তুগীজদের দখলে। ১৬৬১ সালে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিন ব্রাগাঞ্চাকে বিয়ে করে বরপণ পেয়েছিলেন বোম্বাই। রাজা বরপণে প্রাপ্ত বোম্বাই শহরকে লিজ দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। ইতিমধ্যে ইংরেজরা পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপন করেছে। সুরাটের মত পাটনা ও কাশিমবাজারে ইংরেজরা এসেছিল ওলন্দাজদের অনেক পরে।

সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী তখন পূর্ব ভারতের বড় বন্দর। ঢাকার কাছে বন্দর সুবর্ণগ্রামে তখন পত্তন হয়েছে। সপ্তগ্রামকে সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসাবে দেখেছেন সীজার ফ্রেডারিক

১৫৬৩ সালে। সে সময় বছরে ৩০-৩৫টি ইউরোপীয় জাহাজ আসত সপ্তগ্রামে। সীজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামে এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে। তারও আগে ইবন বতুতা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। সে সময় এ দেশের মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতো। ছিল আঞ্চলিক অর্থনীতি। একটি বা পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামে যা কাঁচামাল উৎপন্ন হতো তা ঐ গ্রামগুলির চাহিদা মেটাতো। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন বসত হাট। হাটে বিক্রি হত বারো পয়সায় এক মণ চাউল, ১ টাকা ৪৫ পয়সায় ১ মণ গাওয়া ঘি, ২ টাকায় ১৫ গজ কাপড় এবং ৩ টাকায় একটি দুগ্ধবতী গাভী। চৈতন্য চরিতামৃত লিখেছে ''হিরণ্য গোবর্ধন নামে দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।'' সপ্তগ্রামে বাস করত বেশ কয়েকজন লক্ষপতি বণিক।

ষোড়শ শতাব্দীতেই সপ্তগ্রাম তার জৌলুস হারাতে থাকে। সরস্বতী নদীতে কমতে থাকে জলের গভীরতা। সরস্বতী নাব্যতা হারালে ভাগীরথী তীরে ত্রিবেণী বা হুগলী বন্দর সপ্তগ্রামের মত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বন্দর রূপে দেখা দেয়। ১৬৮৬ সালে এদেশে এসেছিলেন বিদেশী পর্যটক হ্যামিলটন। হ্যামিলটন তাঁর বর্ণনায় হুগলী বন্দরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর বিবরণীতে সপ্তগ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায় না। মনে হয় বিগতযৌবনা বন্দর সপ্তগ্রামকে হ্যামিলটন পর্যবেক্ষণ করেননি।

১৬৮৮ সালের হ্যামিলটনের বর্ণনায় যেমন হুগলী বন্দরের বর্ণনা পাওয়া যায়, মোগল আমলের ইতিহাসে তারও আগে অর্থাৎ ১৬৩২ সালের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় ১৬৩২ সালে হুগলী বন্দর বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। শোনা যায় শাহসুজার এক বেগমের বাঁদীর উপর পর্তুগীজরা অত্যাচার করলে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের হুগলী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁকে। হুগলী তখন পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বন্দর।

হুগলীর আগে বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের ছিল সমৃদ্ধ অবস্থা। ১৬৮৮ সালে হ্যামিলটন সাতগাঁয়ের অস্তিত্ব না দেখলেও দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সাতগাঁই ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর। সপ্তগ্রামের আগে বন্দর ছিল সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ে। ঢাকার কাছে মেঘনা নদীর তীরে সুবর্ণগ্রাম পত্তন হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। আর সোনার গাঁয়ের নাম শোনা যায় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

॥ তিন॥

মতিলাল শীলের পূর্বপুরুষরা থাকতেন সুবর্ণগ্রামে। সুবর্ণগ্রাম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে বাস করত সুবর্ণবণিকেরা। জাতিতে তিনিও ছিলেন সুবর্ণবণিক। শীল বংশের আদি পুরুষের নাম মেঘু শীল। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী বাংলায় রাজা আদিশূরের রাজত্ব। গৌড় বঙ্গের হিন্দু রাজা তিনি। উত্তর ভারতে তখন বৌদ্ধদের ভীষণ দাপট। দলে দলে হিন্দুরা জাত ও ধর্ম বাঁচাতে চলে আসছে রাজা আদিশূরের রাজত্বে গৌড় বঙ্গে। অযোধ্যার কাছে রামগড়। সেখানে বাস করতেন একদল বৈশ্যবণিক সম্প্রদায়। ব্যবসা

বিশেষ করে স্বর্ণব্যবসাই তাদের প্রধান উপজীবিকা। এই বৈশ্য সম্প্রদায়ের শিরোমণি কুশল আঢ্য নেতৃত্ব দিতেন বৈশ্য সম্প্রদায়কে। আচার আচরণে ঐশ্বর্যে ও সংস্কৃতিতে অযোধ্যার রামগড়ের এই বৈশ্য সম্প্রদায় ছিলেন সমৃদ্ধ। বৌদ্ধরা হিন্দুদেরকে জোর করে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করলে বৃদ্ধ কুশল আঢ্যের দুই পুত্র সনক ও সনৎ গুরুপত্নী আত্মীয়বন্ধু ও বহু সংখ্যক অস্ত্রধারীকে নিয়ে পরিত্যাগ করলেন আদি বাসস্থান অযোধ্যার রামগড়। সনকের অনুগামী হল ষোল ঘর প্রধান ও ত্রিশ ঘর অপ্রধান বৈশ্য বণিক। তারা এসে আশ্রয় চাইলেন তৎকালের বঙ্গাধিপতি মহারাজা আদিশূরের কাছে। সনক আঢ্য সহ ঐ ছিচল্লিশ ঘর বৈশ্যর পদবী ছিল বিচিত্র। কুলজী গ্রন্থ লিখেছে- '' দে দত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ শীলঃ সিংহ ধরস্তথা। বড়ালঃ পালো নাথশ্চ মল্লিকঃ নন্দী বর্ধনঃ। দাস লাহাস্থতা সেনঃ ষোউশঃ খ্যাতিরু স্তমা।'' রাজা আদিশূরের কাছে আশ্রয় প্রার্থী হিন্দুদেরকে রাজা আশ্রয় দিলেন তাঁর রাজ্যে। বসবাস করতে নির্দেশ দিলেন ঢাকার কাছে মেঘনা নদীর তীরে। রাজার আদেশে সনক ও তার দলবল বাস করতে লাগলেন সেখানে। সোনার ব্যবসায় ছিলেন এরা পারদর্শী। সনক আঢ্যের সঙ্গে আদিশূরের হয়েছিল বন্ধুত্ব। রাজার ছিল না কোন পুত্র সন্তান। সনকের পরামর্শে রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়ে করেছিলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। স্বর্ণ ব্যবসায় পারদর্শী রাজবন্ধু সনককে ও তার বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত অনুগামীদের রাজা আদিশূর সম্মান জানিয়ে তাম্র ফলকে উৎকীর্ণ করে সুবর্ণ বণিক নামকরণ করেছিলেন। এই বৈশ্য সম্প্রদায়কে সনদ দিয়ে রাজা বলেছিলেন, ''স্বর্ণ বাণিজ্য করিত্বা দত্রস্থিত বিশাং মায়া। সুবর্ণ বণিজ্যত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বর্দ্ধরে। ''অর্থাৎ সুবর্ণ ব্যবসায়ে দিকপাল বৈশ্যগণকে আমি সুবর্ণবণিক আখ্যা দিয়ে সম্মান জানালাম''। সেই থেকে মেঘনা নদীর তীরে বসবাসকারী সুবর্ণ ব্যবসায়ে পারদর্শী ঐ বৈশ্যদের নাম হল সুবর্ণবণিক আর গ্রামের নাম হল সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ।

সনক আঢ্যের জীবন কেটেছিল ভালই তার পুত্রও সনকের মতই ছিলেন শ্রেষ্ঠী। পরের বংশধরের নাম বল্লভানন্দ।

ইতিহাসে দেখা যায় চিরকালই দেশের রাজা প্রয়োজনে ধার নেন শ্রেষ্ঠীর কাছে। সমকালীন রাজাকে ঋণ দিতেন শ্রেষ্ঠী আর কৃষকেরা ঋণ পেত স্বর্ণব্যবসায়ী সুবর্ণবণিকদের কাছ থেকে। এই সুবর্ণবণিকদেরকে দেশ ছাড়া করেছিলেন রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতকে। চক্রান্ত করে বল্লভানন্দ ও তার সমগোত্রীয়দের রাজা বল্লাল সেন দেশ ছাড়া করার আগে পর্যন্ত বল্লভানন্দ ঋণ দিতেন রাজাকে। উদন্তপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে বল্লালসেন বল্লভানন্দের কাছে কর্জ নিয়েছিলেন এক কোটী স্বর্ণমুদ্রা বা নিষ্ক। হেরে গিয়ে কিছুদিন পর আবার যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করলেন বল্লালসেন, বল্লভানন্দের কাছে চাইলেন আরো দেড় কোটী এবার ঋণ দেবার আগে বল্লভানন্দ রাজার কাছে হরিকেনির জমিদারী রেহান রাখতে বললেন। শর্ত দিলেন ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত হরিকেনির রাজস্ব আদায় করবেন তিনি। এতে ক্রুদ্ধ হলেন বল্লালসেন। জোরজুলুম করে বহু বণিকের কাছ থেকে টাকা আদায় করলেন রাজা। ক্ষান্ত হলেন না এখানেই রাজপ্রাসাদে মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করে বণিকদেরকে বসালেন

জল অচল সৎ শূদ্রের সঙ্গে পঙক্তি ভোজে। উত্তেজিত বণিকেরা অভুক্ত অবস্থায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন পাল বংশের লোকেরা তখন বল্লালসেনের বিরোধী, এছাড়াও মগধের পাল রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা। পাল বংশের লোকদের সঙ্গে বল্লভানন্দের যোগসাজশে ক্ষুব্ধ হলেন বল্লালসেন। ঘোষণা করলেন সুবর্ণবণিকদেরকে শূদ্র হিসাবে। ফরমান জারি হল যে ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকদের পূজানুষ্ঠান বা শিক্ষাদান করবে তারাও হবে পতিত। কথিত আছে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বর্ণগাভী দান করেছিলেন বল্লালসেন চক্রান্ত করে একটি স্বর্ণগাভীতে পুরে দিয়েছিলেন অলক্ত (আলতা)। স্বর্ণগাভী দান পেয়ে এক গরীব ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন এক সুবর্ণবণিকের কাছে তা বিক্রি করতে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী ঐ সুবর্ণবণিক ছেনি দিয়ে স্বর্ণগাভী কাটলে লাল রঙ বেরিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ চিৎকার করে ওঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠ গাভীকে সুবর্ণবণিক হত্যা করেছে। রাজদরবারে অভিযোগ পেয়ে রাজা বল্লালসেন বৈশ্য সুবর্ণবণিকদেরকে জল অচল সৎ শূদ্রে পরিগণিত করলেন। সেই সঙ্গে কৈবর্ত্তদের দিলেন মহামাণ্ডলিকের পদমর্যাদা। ফলত সুবর্ণবণিকেরা হয়ে পড়লেন প্রায় অন্তজ জল অচল শ্রেণীভুক্ত। হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর ইত্যাদি শ্রেণীর প্রায় সমগোত্রের শূদ্রে।

এহেন সামাজিক অনাচারে সুবর্ণবণিকরা হলেন দেশছাড়া বল্লভানন্দের সমভিব্যাহারে যারা ছিলেন তাঁরা চলে গেলেন ওড়িশার পুরী কটক ও বালেশ্বরে। কেউ গেলেন কনখলে বা কনকক্ষেত্রীতে। কেউ বা গেলেন শোন নদীর তীরে রোহিতাগিরি নগরে কেউ বীরভূম, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় আর এক দল গেলেন সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রামে বল্লালসেনের গৌড়বঙ্গে যারা থাকলেন তাঁদের জল অচল শূদ্র হিসাবে চলতে হল ত্যাগ করতে হল যজ্ঞোপবীত। পালন করতে হল মাসাশৌচ। একদল গেলেন বর্ধমানের কর্জনায়।

ইতিহাসে ঘটে এমনি বিপরীত ব্যাপার। ইংলন্ডেও স্বর্ণবণিকেরা দেশের লোকের ঋণের চাহিদা মেটাতে রাজাও ধার নিতেন তাদের কাছে। ব্যবসায়ী ইহুদিরা ইংলণ্ডে এসে ব্যবসা শুরু করে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল ইংলণ্ডের স্বর্ণব্যবসায়ীদের দেশের অর্থনীতিকে ঠিক রাখবার জন্য এবং স্বর্ণব্যবসায়ীদের ব্যবসা রক্ষা করবার জন্য ইংলন্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ১৩৯০ সালে আইন করে দেশ থেকে ইহুদিদের তাড়িয়েছিলেন। তাতে বেঁচেছিল ইংলন্ড বেঁচেছিল ইংলন্ডের অর্থনীতি। কিন্তু তার ঠিক দুশো বছর আগে অর্থাৎ ১১৭০ সালে রাজা বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন সুবর্ণবণিকদের দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়ল দুর্বল। শূন্যস্থান পূরণ করতে বিদেশী গুজরাটী ও রাজস্থানী সুদখোর ব্যবসায়ীদের বাংলার অর্থনীতির মূল কাঠামোতে বসালেন রাজা বল্লালসেন। বাংলার অর্থনীতিতে কায়েম হল রাজস্থানী জগৎশেঠ ও গুজরাটীদের আধিপত্য।

সুবর্ণগ্রাম থেকে সুবর্ণবণিকরা গেলেন চলে। সোনার গাঁ বন্দর দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে শুরু করল। যে বন্দর থেকে একদিন বৈশ্য বণিকরা পাড়ি জমাতেন জাভা, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও ইত্যাদি দ্বীপে সেই বন্দর আস্তে আস্তে তার ঐশ্বর্য হারাতে

শুরু করল। অন্যদিকে গড়ে উঠতে শুরু করল বালেশ্বর ও সপ্তগ্রাম বন্দর।

৮. নীরবে পেরিয়ে গেল বাংলার রেঁনেসার অন্যতম স্তম্ভ

মতিলাল শীলের জন্মের সোয়া দুশো বছর

বহু ঢাক ঢোল বাজিয়ে কলকাতার তিনশো বছর পালিত হলেও আমাদের প্রস্তাব মতো তিনশো বছরের কলকাতাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করে বর্তমান রূপে এনে দিলেন সেই সব কলকাতার স্থপতিদের নিয়ে ইতিহাস রচনা অপূর্ণাঙ্গই থেকে গেল। কলকাতা উৎসবও শেষ হয়েছে প্রায় দু দশকের ওপর কিন্তু এই বাংলায় নবজাগরণের দুই স্তম্ভ কলকাতার দুই অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যসাগরকে নিয়ে অপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা ছাড়া নবজাগরণের অন্যকোন স্তম্ভ নিয়ে বিশেষ একটা আলোকপাত হয়নি। কলকাতা উৎসব প্রায় দুদশকের ওপর শেষ হতে না হতে এসে পড়েছিলো রেনেসাঁর শুরুর যুগের বাঙালির বহির্বাণিজ্যের পথিকৃৎ ও সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত মহাত্মা মতিলাল শীলের সোয়া দুই শত জন্মবার্ষিকী। তাঁর জন্মের ইংরেজি সাল বিষয়ে সকলে একমত নন। কিন্তু বাংলা ১১৯৮ সালে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে বিষয়ে পুরাতন পুঁথিপত্রে স্বীকৃতি মেলে। কলকাতার সৃষ্টি বাংলা ১০৯৭ সালে ইংরেজি ১৬৯০ আর মতিলাল শীলের জন্ম ঠিক তার একশো বছর পর ১৭৯১সালে। ৩০০ বছরের কলকাতার গর্ব তার স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন যা কলকাতাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে চিন্তার জগতে অগ্রগামীর সম্মান দিয়েছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় ও সামাজিক ইতিহাসে যতোজন জন্মগ্রহণ করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের মধ্যে অথবা কলকাতাকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এই সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলনের মনীষীদের ছিল চিন্তাগত দিক থেকে অদ্ভুত এক ঐক্য। সামাজিক জীবনে কোনও সংস্কার যখন জনমনে ব্যথার সৃষ্টি করেছে তখন সামাজিক আন্দোলনের মনীষীদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ঐ ব্যথা ও বেদনা দূরীকরণের আন্দোলন। বাস্তব অবস্থায় তা চূড়ান্ত রূপ না পেলেও জাতীয় আন্দোলনের মনীষীদের হাতে পড়ে তা পরিণতি পেয়েছিল অনেকটাই। ইতিহাসে দেখা যাবে কোন সংস্কার আন্দোলন জাতীয়-মনীষীর হাতে এসে চূড়ান্ত পরিণতি হলেও তার পূর্বসূরি ছিলেন হয়তো অন্য কোনও সামাজিক আন্দোলনের মনীষী। মধ্যযুগে অনেক রাজার সঙ্গে পেশোয়া বাজীরাও সতীদাহ রদ করতে যেমন অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁর সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ পেল রামমোহনে এসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিধবা বিবাহ প্রচলনে মতিলাল শীল যে আন্দোলন করেছিলেন ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যসাগরে

এসে তা পরিণতি পেয়েছিল। সেকালের পত্রপত্রিকা ও পুঁথিতে পাওয়া যায় বিধবা বিবাহ বিষয়ক চিন্তার উদ্গাতা মতিলাল শীলেরই।

মতিলাল শীলের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন সপ্তগ্রামে। তারও আগে সুবর্ণগ্রামে বা অযোধ্যার রামগড়ে। মতি শীলের পিতা চৈতন্যচরণই সপ্তগ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার বড়বাজারে কাপড়ের দোকান করেন। কলকাতা তখন ১৭৫৬ সালের সিরাজদৌলার আক্রমণে বিধ্বস্ত আর ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। দস্যু মোহনের অত্যাচারে কলকাতার জনজীবন তখন ব্যতিব্যস্ত। মতিলাল শীলের পিতা চৈতন্যচরণ শীল বুদ্ধি এঁটে দস্যু মোহনকে ধরিয়ে দিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে পুরস্কৃত করেছিল।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সতের বছর বয়সে বিয়ে হয় সুর্তিবাগানের নাগরী দাসীর সঙ্গে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন উত্তর ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র-মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর।

প্রথম জীবনে মতিলাল শীল ফোর্ট উইলিয়ামের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ঐকাজের মধ্যেই ঐদুর্গের সৈন্যদেরকে তিনি সরবরাহ করতেন পণ্যসামগ্রী ও ব্যবহার্য্ দ্রব্য। এখন যেখানে জি পি ও সেখানে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম আর যেখানে এখন রাইটার্স বিল্ডিংস সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কিছু দিন তিনি কাস্টমস দারোগারও কাজ করেছিলেন।

এক সময় হয় মতিলালের ভাগ্যের পরিবর্তন। কাকা গৌরমোহনের একমাত্র বিধবা কন্যার বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর। একদিন দেখেন অনেক খালি বোতল বিক্রি হচ্ছে সস্তায়। কাকার মেয়ের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কিনে ফেললেন ঐ খালি শিশি-বোতলের স্তুপ। প্রচুর লাভ হলো। আর এই হল মতিলাল শীলের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা।

১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত মতিলাল পাক্কা ব্যবসায়ী। প্রথমে স্ট্রান্ড ফ্লাওয়ার মিলের মিস্টার স্মিথসনের মুৎসুদ্দি। তারপর একে একে মেসার্স লীচ, কেটল ওয়েল লিভিং স্টোন, সাটরেরেস প্রভৃতি নয় দশটি বিদেশী কোম্পানির বেনিয়ান মতিলাল শীল।

মতিলাল শীলের জীবন ও কার্যাবলী সেকালের সমাজ-জীবনে জোয়ার তুলেছিল, তাঁর সম্পর্কে তৎকালের চরিতাষ্টক গ্রন্থ, সুবলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধান, রেমিনিসেন্স অ্যান্ড অ্যানসেকডোটারস্ অব গ্রেট মেন অব ইন্ডিয়া, রেভারেন্ড লালবিহারী দের দি ব্যাংকারস কাস্ট অব বেঙ্গল, ডঃ রমেশ মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস, পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ ও সমসাময়িক সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ, বেঙ্গল স্পোকটেটর, ক্যালকাটা রিভিউ, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। ১৮৩৬ সালে জাহাজের কারবারে নেমেছিলেন মতিলাল শীল। তখন বাংলাদেশে বড় বড় ব্যবসায়ী। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মদনমোহন

দত্ত, সাগর দত্ত, নিমাইচরণ মল্লিক, রামদুলাল দে সরকার, রুস্তমজি কাওয়াস জী। প্রথম ও সব থেকে বড় জাহাজটির নাম রাখেন বড় মেয়ে রাজরানীর নামে। ক্রমে ১২/১৩টি জাহাজের মালিক হন তিনি। দ্বারকানাথ ঠাকুর সে সময় গার্ডেনরীচে চুটিয়ে জাহাজের ব্যবসা করছেন। তখন সবেমাত্র ইংল্যান্ডে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালু হয়েছে। মতিলাল শীল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ বানালেন এদেশে। নাম দিলেন 'বেনিয়ান'। ভাসিয়ে দিলেন সেই বাষ্পীয় জাহাজ নীল সমুদ্রে। বঙ্গোপসাগর ছেড়ে মতিলালের জাহাজ বাণিজ্য করতে পাড়ি জমাল চীন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

মতিলাল শীল ছিলেন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এদেরই এক শ্রেষ্ঠী বল্লভানদের ধনসম্ভারে ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজক্ষমতায় বলীয়ান রাজা বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদেরকে পতিত বলে ফরমান জারি করেছিলেন সে ইতিহাস কে না জানে। সুবর্ণ বণিকদের ধন ঐশ্বর্য থাকলেও কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাদের হাতে জল চলত না। স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলত সকলে। এহেন সম্প্রদাযের মুখেও মতিলাল অনুভব করেছিলেন দুঃখীর দুঃখ ব্যথীর বেদন। যখন ধনী হয়ে উঠেছেন তখনই শুরু করলেন দান। প্রথমে জ্বরের হাসপাতালে দান, তারপর প্রতিষ্ঠা করলেন প্রসূতি সদন, মীর্জাপুরে কুষ্ঠরোগীদের আবাসস্থল, বিধবা ও অনাথ সাহায্য ভাণ্ডার। এখনকার মেডিকেল কলেজের আগে সংসৃক্ত কলেজ সংলগ্ন যে মেডিকেল কলেজ ছিল সেখানকার ত্রিশটি রুগীরই ব্যয়ভার বহন করতেন তিনি।

মেডিকেল কলেজ তৈরির প্রস্তাব হলে তাঁর বাড়ি সংলগ্ণ ১২ বিঘে জমি দান করলেন তিনি। তার সঙ্গে অর্থ। এতে তাঁর বাড়ি সংলগ্ণ বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হল। তা হোক। দেশের মানুষের যদি রোগ নিরাময় হয়।

১৮৪০-৪১ সালে কলকাতায় আশেপাশের গ্রামএলাকা থেকে প্রচুর ভিখিরী আসত। মতিলাল শীল একটি সভা করেন। কলকরাতার ১৬ মাইলের মধ্যে কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে তার জন্য কলকাতার চারদিকে চারটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন । চোরাবাগানের বিখ্যাত মার্বেল প্যালেসের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক নেন কলকাতার অভ্যন্তরে একটি

অন্নসত্রের ভার। আর মতিলাল শীল দায়িত্ব নেন কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণে দুটি অন্নসত্রের। যেই চিন্তা সেই কাজ। ১৮৪১ সালে ত্রিশ বিঘা জমির উপর বেলঘরিয়াতে স্থাপিত হয় মতিলালের দেবালয় ও অতিথিসালা, তাঁর নির্দেশে তাঁর পৌত্র গোপাললাল শীল ১৯১৪ সালে স্থাপন করেন বেহালার দুর্গাপুরে ঠাকুরবাড়ি ও অন্নসত্র কুড়ি বিঘা জায়গার উপর। ঐ দুই অন্নসত্র থেকে এখনও দৈনিক সহস্রাধিক নিরন্ন মানুষের ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবারণ করা হয়।

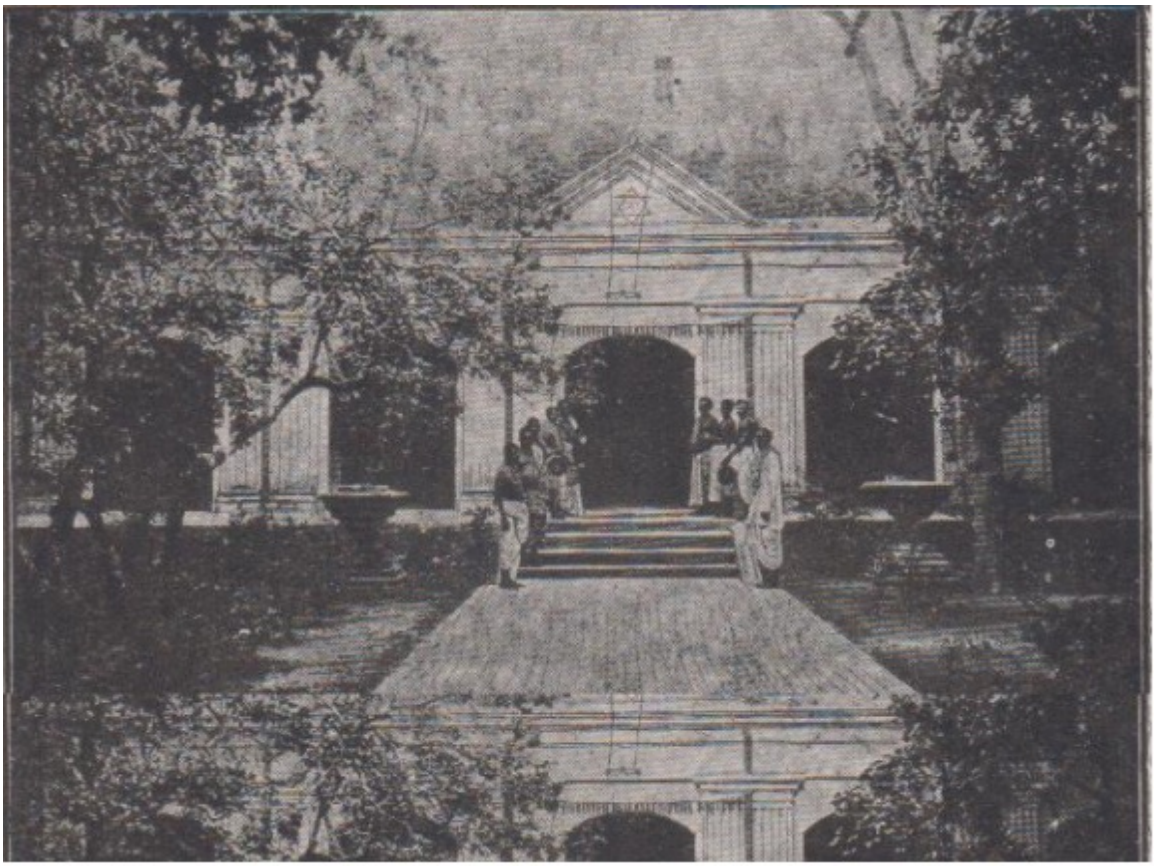

দেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার গৌরবই মতিলালের শুধু প্রাপ্য নয়। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ঠিকমত চালাতে প্রয়োজন ভাল ডাক্তারের। মতিলাল শীল একলক্ষ টাকা দিলেন মেডিকেল কলেজের ভাল ছাত্রদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করতে। প্রিন্স দ্বারকানাথও চেয়েছিলেন এদেশে ভাল ডাক্তার। তাই দ্বিতীয়বার লন্ডনে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এদেশের দুই কৃতী ছাত্র গোপাল শীল ও আর একজনকে ডাক্তারি পড়াতে। ১৮৪২ সালে মতিলাল শীল স্থাপন করলেন ফ্রি কলেজ। আজও যা মহাত্মা গান্ধী রোড ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে মতিলাল শীলের কীর্তিকথা প্রচার করছে সগৌরবে। আ াচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঠ নিয়েছেন এই বিদ্যালয় থেকে। শুধু দান করেই ক্ষান্ত হননি মতিলাল শীল। ঐ দানের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ও চালু রাখতে প্রয়োজন অর্থের তা তিনি জানতেন। অন্নসত্র, অবৈতনিক কলেজ ও অনাথ বিধবাদের সাহায্য-ভাণ্ডার চালু রাখতে মতিলাল শীল তাঁর মধ্য কলকাতার মূল্যবান চারটি বাড়ি দান করে ট্রাস্ট করে

গিয়েছেন।

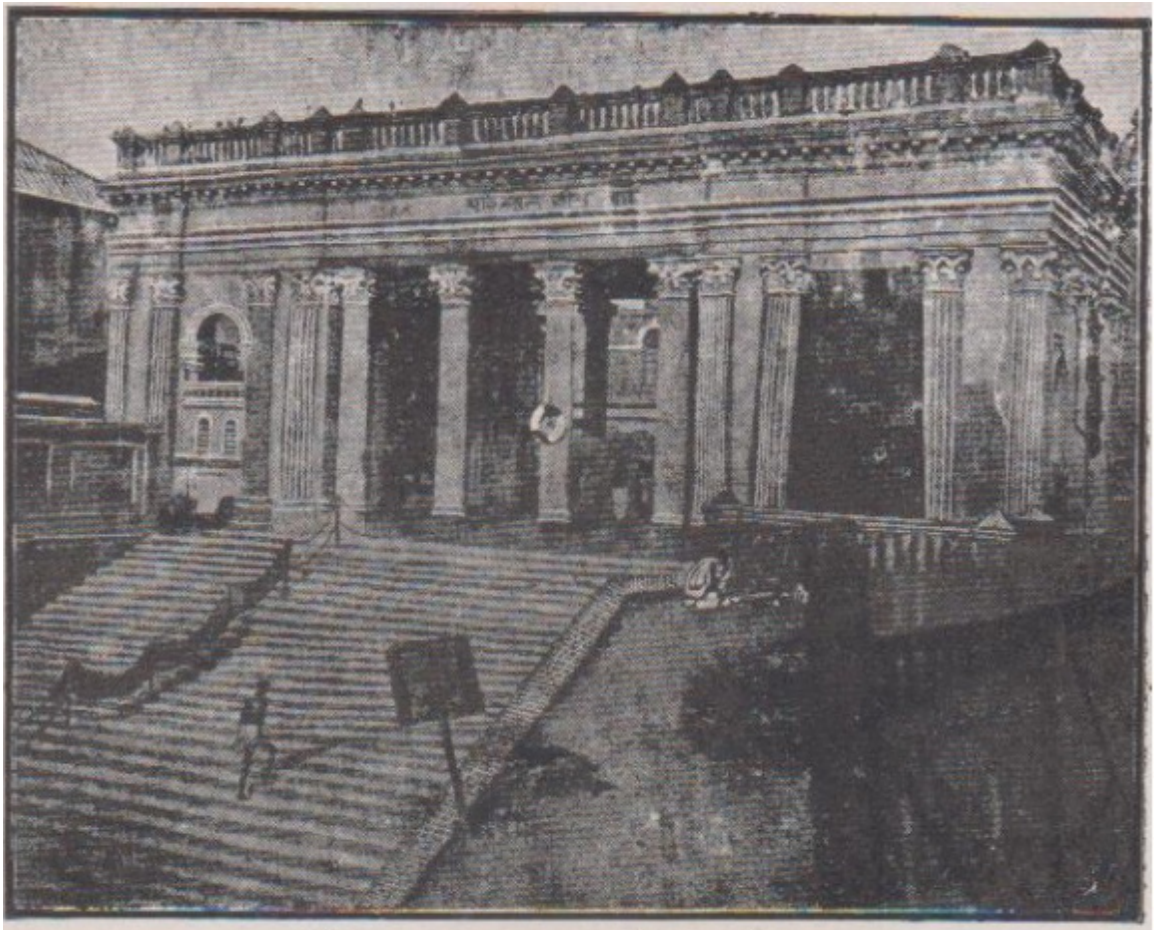

মতিলাল শীল স্নানের ঘাট ঃ কলিকাতা

হাওড়া ব্রীজের কাছে পুণ্যার্থী জনসাধারণের স্নানের জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন স্নানের ঘাট।

চিৎপুর থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর পয়ঃপ্রণালিও নিজব্যয়ে করে দিয়েছিলেন তিনি। দুর্গাপূজা ও বিভিন্ন উৎসবে ঋণ দায়ে কারারুদ্ধ কয়েদিদের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতেন। কতজনের ঋণ মকুব করে দিয়ে দায়বদ্ধ সম্পত্তি মুক্ত করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ সালে মতিলাল শীলের ১৭৯১/৯২ আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮২০ সালে। মতিলাল শীল রামমোহনের থেকে ১৭/১৮ বছরের ছোট ও বিদ্যাসাগরের থেকে ২৮/২৯ বছরের বড় ছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্বাদ কৌমুদীর প্রকাশক ও সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্বেল প্যালেস প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক সকলেই ছিলেন মতিলাল শীলের সমসাময়িক ও এঁদের সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রীতির সম্পর্ক।

সে সময় গোটা বঙ্গে মতিলাল শীলের মত বড় ব্যবসায়ী খুব কম ছিল। তাঁরমত ধনী ও প্রগতিশীল মানুষকে সঙ্গে পেতে সকলেই চাইতেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যবসায়ী ও সমাজ প্রধানেরা রামমোহনের সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সতীদাহের সমর্থনে গোঁড়া হিন্দুদের নিয়ে দল গড়ে রামমোহনের বিরোধিতা করলেন। স্থাপন করলেন ধর্মসভা নামে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের বিরোধী সংগঠন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এর সম্পাদক। মতিলাল শীল ছিলেন উভয় দলের মাঝখানে, তিনি এই প্রশ্ণে উভয় দল থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখতেন। ঘৃণা করতেন ধর্মসভার গোঁড়ামি, দলাদলি ও জাতিচ্যুতি বিষযের প্রস্তাবকে। ভবানীচরণ ঐ ধর্মসভায় যোগদান করবার জন্য মতিলালকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মতিলাল বলেছিলেন, ''এই সভায় যোগদান না করার প্রধান কারণ ইহা ধর্মসভা নহে, ইহা একটি অধর্ম সভা। এই সভার মিথ্যা করিয়া ধর্মসভা নামকরণ হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমাদের সমাজের উন্নতি ও রক্ষার কার্য সংশাধিত হইতেছে না। অপর দিকে এই সভার দ্বারা ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত কর্তব্যসমূহের বিনাশ ও বিচ্যুতিই সাধিত হইতেছে।'ধর্মসভাকে তিনি সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরামর্শ দেন।

তাঁর পরামর্শে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার অধিবেশন ডাকেন। অধিবেশনে মূল বক্তা মতিলাল শীল তেজস্বী ভাষায় বলেন, ''আ সি অ্যারাউন্ড মি রিচ মেন, পসেসিং লার্জ ফান্ডেড অ্যান্ড ল্যান্ডেড প্রপারটি। হোয়াট আই আসক্ দেম ইস নট টু ডিপ্রাইভ দেমসেলভস অফ দেয়ার নেশেশারিস অ্যান্ড কমফর্টস, বাট স্পেন্ট অ্যান ইনফিনিটেসিমল পোরশন অফ দেয়ার লাকজুরিয়াস সেস ফর দি হোমলেশ অ্যান্ড দি ফুডলেশ।''মতিলালের উদাত্ত আহ্বানে একটি অনাথ ও বিধবা সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়।

মতিলাল শীল ঐ ভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে হন প্রথম ডোনার। ধর্মসভা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। বিলুপ্ত হল রাজা রামোহন রায়ের মতাদর্শ-বিরোধী মঞ্চ তথাকথিত 'ধর্মসভা'। এইভাবেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মতিলাল শীল রাজার আন্দোলনে পরোক্ষে সাহায্য করে রাজার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করলেন।

এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য রাজা রামমোহনের প্রধান সহযোগী ছিলেন দুজন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মহাত্মা মতিলাল শীল। উভয়েই রাজার স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনে বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মতিলাল মনে করতেন ইউরোপীয় শিক্ষা এদেশের মানুষকে নতুন যুগে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। তিনি বলতেন, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমি মনে করি দেশের ব্যবসার উন্নতি করতে হলে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আদর্শে তিনি একটি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই উদ্দেশ্যে একটি সভা হয় তাঁর বাড়িতে। প্রিন্স দ্বারকানাথ

ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিভি কাউন্সিলের প্রধান বিচারপতি স্যার জে পি গ্রান্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হয়ে মতিলালকে উৎসাহিত করেছিলেন। স্থাপিত হয় শীলস ফ্রি কলেজ।

রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিরোধক আইন (সতী রেজুলেশন অ্যাকট ১৮২৯) পাশ হয়। সে সময় দেশে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। একজন কুলীনের থাকত ২০/৩০ এমনকি ৫০/৬০টি স্ত্রী। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে হতো অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের পুণ্যের লোভে। কুলীন ব্যক্তি মারা গেলে বিধবা হতো কচি মেয়েরা। সতীদাহ বিরোধী আইন যতদিন হয়নি ততদিন চাপানো হত তাদের স্বামীর চিতায়। আইন পাশ হলে দেশে বিধবাদের সংখ্যা বেড়ে গেল আর কচি কচি মেয়েদের বৈধবা-যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখে কচি বিধবা মেয়েদের বাপ-মায়ের ব্যথা বেদনা সমাজপতিদেরও ভাবিয়ে তুলল।

মতিলাল শীলই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পুরুষ যিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের কথা প্রথম চিন্তা করেছিলন। মতিলাল শীল তখন বঙ্গের সর্ববৃহৎ ব্যবসাদার। তাঁর মত বৃহৎ বণিক যা বলেন তা অনেকেই মেনে নেন। শোনা যায় মতি শীলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-কন্যা বালবিধবা হয়েছিলেন। বালবিধবা আত্মীয়া কন্যার মলিনমুখ মতিশীলকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী করেছিল। ২৯শে এপ্রিল ১৮৩৭ সমাচার দর্পণ লিখেছে ''আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে ও সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন। সভার প্রধান কার্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে চেষ্টা করিবেন এবং শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণকে স্বাধীন করতঃ শৃংখল হইতেমুক্ত করিতে পারিবেন।'' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স তখন সতের বৎসর। ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে বের হন। ১৮৪২ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের কাজ পান। ১৮৫১ সালে তিনি হন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ১৭৭৬ শকাব্দ (ইংরেজি ১৮৫৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা স্বাক্ষরিত বিধবা 'বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' নামক প্রবন্ধ। ১৮৫৫ সালে এ বিষয়ে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দেখা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও অন্তত ১৮ বছর পূর্বে মতিলাল শীল বিধবা বিবাহ প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৮৪০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ''সমাচার দর্পণ'' লিখেছে-'শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল লক্ষ্মমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তার ওসালসী সাহেবের অধীনে গর্ভিনী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থে এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এ বিষয় আমাদিগের সম্বাদপত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে। অনেক বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রীগণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থে অত্যন্ত উদযোগ করিয়াছিলেন।''মতিলাল শীল যে বিধবা বিবাহের প্রথম উদ্যোগী সে বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে ডি এল রায় প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ পত্রিকা তার বাংলা ১৩৩৮ সনের

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘‘বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আন্দোলন চালাইবার বহু পূর্বে তিনি এই প্রথার ও অন্যান্য সমাজসংস্কারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যিনি সাহস করিয়া প্রথম বিধবা বিবাহ করিবেন তাঁহাকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। শোনা যায় একজন বিধবা বিবাহ করে তা পেয়েছিলেন।

ইংরেজরা যখন এদেশে এসেছিল তখন এদেশের ধনী ব্যবসায়ীগণ ইংরেজদের দাদন (ধার) দিতেন এদেশের বণিকদের সহায়তায় ইংরেজরা এদেশে ব্যবসা করেছে চুটিয়ে। আবার ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় ও সংস্পর্শে এদেশীয় ব্যবসায়ীগণ ইংরেজদের বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি গিরি করে বেশ ধনী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কালে দেশীয় বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের হয় দ্বন্দ্ব। দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে নিলে ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিখ্যাত মিচেল অ্যান্ড কোম্পানী সহ ৯টি ইংরেজ সওদাগরী সংস্থা ৩২ কোটি টাকা লোকসান করে উঠে যায়। ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ তার ৩৫ ভলিয়ুমের সংখ্যায় এ তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রথম ঝোঁক সামলিয়ে নিয়েই কিন্তু ইংরেজ সরকার ইংরাজ সওদাগরদের ওপর থেকে কর তুলে নিয়ে বাঙালি বণিকদের ওপর দ্বিগুণ কর চাপিয়ে দেয়। পিছু হটতে থাকে বাঙালী বণিকেরা। আর পাঁচজন ধনী ব্যবসায়ীর মত অন্য ব্যবসায় না গিয়ে মতিলাল ও জমিদারী কেনা ও গৃহ তৈরি করে ভাড়া দেওয়ায় মন দেন। ক্রমে তিনি বাঙলার অন্যতম বড় জমিদার ও অধিক সংখ্যক গৃহের মালিক হয়ে ওঠেন। মতিলাল শীলের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হীরালাল শীলের পত্নী কুসুমময়ী দাসীর আনিত হাইকোর্টের ২।১৮৯২ নম্বর আপিল মামলায় দাখিলী মতিলালের সম্পত্তির তালিকা থেকে দেখা যায় এক কলাকাতয় মতিলাল শীলের ১৯৩টি পাকা বাড়ি ছিল। এর মধ্যে পুরাতন স্টেটম্যানের বাড়ি, গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে রডাকোম্পানির বাড়ি নিউ মার্কেটের সামনের অংশের বাড়ি এবং চাঁদনীচক অন্যতম।

দরিদ্র অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে উঠে এসেছিলেন মতিলাল। বিষয়সম্পত্তি তিনি উপার্জন করেছিলেন যেন গরীবের কল্যাণে নিয়োজিত করতে। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন বঙ্গের সবথেকে বড় দানী ব্যক্তি। ১৮৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট থেকে তাঁর স্থাপিত জনকল্যাণকর সংস্থাগুলি তো চলছেই সেই পদে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের কন্যা বংশীয় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দানবীর কালিদাস মল্লিক মতিলাল শীলের সম্পত্তির উপার্জনকে ট্রাস্ট ফান্ড করে জনকল্যাণে নিয়োজিত করে গিয়েছেন। মতিলাল শীলের সম্পত্তির উপার্জন থেকে কালিদাস মল্লিকের পরিকল্পনায় ও দানে গড়ে উঠেছে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের কোবাল্ট ইউনিট, সুবর্ণবণিক সমাজ পলিক্লিনিক, কালিদাস মল্লিক সেবায়তন, কালিদাশ মল্লিক ইনস্টিটিউট অব রুরাল আরবান ইন্টার ফেস পলি টেকনোলজি ও মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা সুবর্ণবণিক সমাজরে পরিচালনায় মহিলা সুচীশিল্প শিক্ষা নিকেতন। কত শত সহস্র রোগী ও শিক্ষার্থী যে এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই।

আজ বাঙালী আত্মমুখী হয়ে পড়েছে। ব্যবসা করে বড় হওয়া বা দেশ ও জাতিকে বড়

করা নয় কেরানিগিরির মোহে জাতি আজ নিজেকে বিলীন করতে চলেছে। পয়সা যে কারো কারো নেই তা নয়-কিন্তু ধনীদের সে মানসিকতা আজ অন্তর্হিত। শুধু অকাতরে দানই নয় দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন বা সংস্কার দূরীকরনণ ধনী ব্যক্তিরাও আজ বিমুখ। মতিলাল শীলের জীবন ও আদর্শ ও তাঁর উপার্জিত সম্পদ যুগ যুগ ধরে যে মানব কল্যাণে নিয়োজিত থেকেছে বা থাকবে তা কেবল তাঁর সৎপথে উপার্জিত সৎচিন্তায় প্রতিষ্ঠিত সম্পদ বলে।

মুর্শিদাবাদের বিদ্যোৎসমাজ (১৮৫৩-১৯৪৭)

অনিরুদ্ধ দাস

বাংলার ইতিহাসের উনিশ শতক ঐতিহাসিকদের অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়। উনিশ শতকের বাংলাকে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের ইটালীর সঙ্গে এবং কলকাতাকে ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তুলনা করা য়ায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক অব্যাহত। ঐ সময়ের বাংলার রেনেসাঁস সংস্কৃতির অনেক সীমাবদ্ধতার কথাও ঐতিহাসিকরা বলেছেন। বিভিন্ন মতাদর্শের লেখক ঐতিহাসিকরা বাংলার রেনেসাঁস নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। কেউ বাংলায় রেনেসাঁস সংস্কৃতিকেই নস্যাৎ করেছেন, কেউ পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন, কেউ বা এক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই সংস্কৃতিকে মেনে নিয়েছেন। বাংলার রেনেসাঁস সংস্কৃতি শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল, না কি অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিস্তৃত গবেষণার বিষয় হতে পারে। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ এই বিদ্যোৎ সমাজের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। সমসাময়িক মুর্শিদাবাদের বিদ্যোৎ সমাজের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কলকাতা ব্যতিরেকে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে নবজাগরণের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। সমসাময়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীগণ, যাঁরা এই আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিলেন, তাঁদের কর্মের এক পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এ তথ্যই প্রকাশ করে। বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বুদ্ধিজীবীগণ মূলত কাজ

করেছেন কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে, এদের মধ্যে কয়েকজন কলেজের শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্র হিসেবে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রেভারেন্ড ই.এম.হুইলার, রেভাঃ লালবিহারী দে, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদ এই কৃষ্ণনাথ কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী এবং কালীকিংকর দত্ত প্রমুখ ছিলেন এই কলেজের ছাত্র, শিক্ষাবিদ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রামদাস সেন, সঙ্গীত শিল্পী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী মাষ্টারদা সূর্য সেন, শহীদ নলিনী বাগচী প্রমুখ বিভিন্ন ভাবে এই জেলার উন্নতির ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, রাজা কৃষ্ণনাথ এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শিক্ষা বিস্তারে দান করেছেন উদার হস্তে। এই সব চিন্তাবিদদের অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল সমসাময়িক বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপূরক।

রাজা কৃষ্ণনাথ সম্পর্কে বলা যায় তিনি এ জেলার প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগেই বহরমপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৪১ সালে ১৯ বছর বয়সে জমিদারী গ্রহণের পর তাঁর চিন্তা ছিল, তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে বহরমপুরে কলেজ স্থাপন করা হবে তিনি চেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই কলেজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবেন। ১৮৪৪ সালের ৩০ শে মে অক্টোবর অর্থাৎ মৃত্যুর একদিন আগে তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম কলেজ থেকে পরিবর্তন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি চেয়েছিলেন এখানে পড়ানো হবে চলতি বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি, লাতিন এবং সংস্কৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং দেশীয় লোকেদের চাকরি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও তাঁর ইচ্ছাপত্রকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে। কিন্তু ১৮৫৩ সালে তাঁর চিন্তাকে স্মরণ করে স্থাপিত হয় বহরমপুর কলেজ। ১৯০২ সালে যার নাম পরিবর্তন হয় কৃষ্ণনাথ কলেজ-এ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এডুকেশন কমিটি বেসরকারী কলেজগুলির এজেন্সী দায়িত্ব না নেওয়ায় তা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁদের দানের মাধ্যমে এই কলেজকে টিকিয়ে রাখেন ১৮৭১ সালে পুনরায় যখন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন থেকে পুনরায় এই কলেজের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন রাণী স্বর্ণময়ী, রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর এবং মুর্শিদাবাদের অন্যান্য ব্যক্তিত্ববর্গ সরকারী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন তাঁদের যুক্তি ছিল পড়াশোনার জন্য কলকাতা বা হুগলী যাওয়া দুষ্কর এবং রাজশাহী, মালদা এবং আশেপাশের অন্যান্য জেলার ছেলেরা পড়াশুনার জন্য বহরমপুর কলেজের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা উচ্চবেতনভুক ইউরোপীয় অধ্যাপকের বদলে স্বল্পবেতনভুক দেশীয় অধ্যাপক নিয়ে াগের কথা বলেন। রাণী স্বর্ণময়ী তিন হাজার টাকা দান করেন কলেজ হস্টেলের জন্য ফাণ্ড প্রস্তুতিতে। ১৮৭২ - ৮৭ সালের মধ্যে বহরমপুর কলেজ আবার সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে বিপন্নতার সম্মুখীন হয়। রাণী স্বর্ণময়ী ১৮৮৬ সালে প্রস্তাব দেন তিনি

মাসিক হাজার টাকা হিসাবে দান করবেন পাঁচ বছর কলেজের উন্নয়ন খাতে কলেজকে বাঁচাতে এছাড়াও এগিয়ে এসেছিল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি। ১৮৮৭ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বহরমপুর কলেজের এবং স্কুলের দায়িত্ব তুলেদেন একটি বোর্ড অফ ট্রাস্টির হাতে এই বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামদাস সেন, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বাবু গোপালচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ। বোর্ডের প্রথম দিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা। একই সঙ্গে নিযুক্ত হয়েছিলেন সতীশচন্দ্র মুখার্জী, ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যিনি পরবর্তী স্বদেশী যুগে ডন সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। বোর্ড অফ ট্রাস্টি কলেজের ফি পাঁচ টাকা থেকে কমিয়ে করে তিন টাকা ছাত্র সংখ্যা ২৪ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪। কলেজ লাইব্রেরিতে এই সময় ছিল প্রায় ১৬ হাজার বই, কলেজ কমনরুমে নেওয়া হত কুড়িটি জার্নাল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য কুড়ি হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা হত বহরমপুর কলেজিয়েট সুক্লে প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য এবং পুরসভা পরিচালিত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য।

রাজা কৃষ্ণনাথের দানে প্রকাশিত হয়েছিল মফঃস্বল বাংলা থেকে প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী, ১৮৪০ সালের ১০ই মে। সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। কৃষ্ণনাথ সংবাদপত্রের প্রকাশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করেছিলেন লণ্ডন থেকে। এই ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই, কলকাতা থেকে ইংরেজী ভাষায় জি.এইচ. হাটম্যান কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক ক্যালকাটা কুরিয়র পত্রিকার ১৮৪০ সালের ১৪ই মে সংখ্যায়। ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালে এই সংবাদপত্রকে উদারমনস্ক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাইহোক কালেক্টর টেলর এবং ম্যাজিস্ট্রেট হ্যারি এলিয়ট এই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেন সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক লেখার জন্য। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী সরকার এই সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। রাজা কৃষ্ণনাথ এবার প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায় মুর্শিদাবাদ নিউজ রাজা কৃষ্ণনাথের সংবাদপত্রে স্বাধীনতার নিরিখে এই কাজ উল্লেখের দাবি রাখে।

নাটোরের রাণী ভবানীর জমি ছিল মুর্শিদাবাদের বড়নগরে। ১৭৪৮ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর সেইসব জোতজমার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি দান করতেন এক হাজার টাকা। টোলের পণ্ডিতদের বৃত্তি ও দান করতেন। টোলের ছাত্রদের দেওয়া হত দৈনিক পাঁচশ গ্রাম করে চাল। তাঁর নিযুক্ত চিকিৎসকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করত। তিনি তাঁতীদের টাকাও ধার দিতেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অবদান মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিজীবীদের জগতে অপরিসীম। তিনি ছিলেন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং ইণ্ডিয়ান ইন্ডাসট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের

সদস্য। তাঁর উদ্যোগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভা হয় কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। সেখানে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বহরমপুর কমার্শিয়াল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীশচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ এবং বেঙ্গল পটারিজ ওয়ার্কস-এর মতো সংগঠন তাঁর দানে পুষ্ট।

গঙ্গাধর কবিরাজের গীতা, উপনিষদ এবং মনুসংহিতার উপর টীকা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন এইসব গ্রন্থের পুনর্পাঠ এবং টীকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করার জন্য তার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন পরাশর সংহিতা থেকে। সংসৃক্ত সাহিত্যে পন্ডিত কবিরাজ গঙ্গাঁধর সেন চরক সংহিতা সম্পদনা করেন ও' জল্পকল্পতরু' নামে একটি টীকা রচনা করেন। উপনিষদ গীতা ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। তিনি মনু সংহিতার টীকাও রচনা করেন। তিনি বহরমপুরে প্রসাদভঞ্জন নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ১৮৮৫ সালের ১২ই এপ্রিল জন্ম হয় রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের। পরবর্তীতে তিনি প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধারের শিক্ষা নেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধু প্রদেশে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। ১৯১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রাচীন মুদ্রা' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কান্দী মহকুমায়। কলকাতার রিপন্ কলেজের তিনি ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক। তিনি নবজীবন, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'অরন্ধন' স্লোগান তাঁরই তোলা। তিনি বাংলায় বিজ্ঞান লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। কলেজে তিনি বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর ছাত্র প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রদের বোঝানোর জন্য বাংলায় পড়াতেন। তাপর পরীক্ষার জন্য পড়াতেন ইংরাজিতে। দুষ্ট ছাত্রদের উপর জরিমানা আরোপ করে সেই অর্থ তিনি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য খরচ করতেন। ছাত্রদের তিনি বোঝাতেন তারা ভালো ব্যবহার করলেই ভারত সুনাম অর্জন করবে। তাঁর অনুরোধেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আপার সার্কুলার রোডে সাত কাঠা জমি দান করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ ভবন তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রামেন্দ্র সুন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর অনুরোধেই লালগোলার রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ পরিষদ ভবনের প্রথম তলটি তৈরি করে দিতে রাজী হন। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় তিনি বাংলায় হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাবের উপরে জোর দেন। ১৯১৯ সালে তিনি মারা যান।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপক যিনি জাহাজে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন, সেই রামদাস সেনের জন্ম বহরমপুরে ১৮৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর। তাঁর বেশিরভাগ লেখাই যেমন 'ঐতিহাসিক রহস্য', ইতিহাস ও অন্যান্য সহযোগী বিষয়ক।

তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে এসে বসতেন বহরমপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লেখার জন্য ব্যবহার করেছিলেন রামদাসের গ্রন্থাগার। বহরমপুরে থাকাকালীনই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সালে প্রকাশ করেন তাঁর 'বঙ্গদর্শন'। তাতে রামদাস লেখেন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ। রামদাসের লেখা অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বসঙ্গীত লহরী, কুসুমমালা, বিপ্লব তরঙ্গ, কবিতা লহরী, ভারত রহস্য, বাঙালীর ইউরোপ দর্শন ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক লেখায় তাঁর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের। ১৮৮৪ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় রামদাস সেনের স্তুতি করা হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বাংলায় লেখার জন্য। ইটালীর ফ্লোরেনটিনো অ্যাকাডেমী ডক্টরেট ডিগ্রী দেয় রামদাসকে। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সঙ্গেও চিঠির আদান প্রদান ছিল রামদাসের। ১৮৮৭ সালের ১৯শে আগষ্ট ৪২ বছর বয়সে মারা যান রামদাস। ঐ বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় ইয়ং বেঙ্গলের পথানুসারী হওয়া সত্ত্বেও রামদাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের ত্রুটি দেখা যায় না। ১৮৯৯ সালে ইটালীর সিগনর রন্ডনীর তৈরি রামদাসের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ক্যাম্পাসে।

মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। ১৮৪৫ সালে (অন্যমতে ১৮৪৬) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লালগোলা, জঙ্গীপুর এবং বহরমপুরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল তাঁর দানে পুষ্ট। বহরমপুরের গ্রান্ট হল তাঁরই দানে তৈরি। ১৯১০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি আশি হাজার টাকা মূল্যের কোম্পানি পেপার দেড় হাজার টাকা সুদ সহ দান করেন বহরমপুরের মাতৃসদন তৈরির জন্য।

বিশ শতকের প্রথম দশকে দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত প্রকাশ করেন জঙ্গীপুর সংবাদ। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন তাঁর বিদূষক পত্রিকা।

জঙ্গীপুর সংবাদের একটি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হত একটি মন্দির ও একটি মসজিদের ছবি সঙ্গে একটি কবিতা

মন রসনা মাফকর ধর গরিবী বেশ

মিঠি বোলি লে কে চল সবহি তু মাহা দেশ॥

জঙ্গীপুর সংবাদে প্রকাশিত ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায় জঙ্গীপুর পুরসভা নির্বাচনে তিনি এক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক নিরক্ষর সৎ ব্যক্তিকে জিততে সাহায্য করেছিলেন। মদ্যপান - বিরোধী দাদাঠাকুর লেখেন 'দাদাঠাকুরের বোতল পুরান'।

''দেবী। সুরেশ্বরী। বোতলবাসে ভূতল শায়ী কর নিজ দাসে

নর্দ্দম-কর্দ্দম লিপ্ত শরীরে, কাপুরুষাধম কর কত বীরে।'

স্বাধীনতা আন্দোলনেও মুর্শিদাবাদ জেলার যথেষ্ট অবদান ছিল। বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসের সময় কৃষ্ণনাথ কলেজ ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। কলেজের অধ্যক্ষ রেড হুইলার বিপ্লবীদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা মাষ্টারদা, সূর্যসেন ছিলেন এই কলেজেরই ছাত্র। জেলার অন্যতম প্রখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন নলিনী বাগচী।

রেড হুইলার ছিলেন রেড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্সের ফুল সম্পর্কিত কবিতা পড়ানোর সময় হুইলার ক্লাসরুমে সেইসব ফুল নিয়ে আসতেন। স্বদেশী যুগে কলেজ হোস্টেলে পুলিশি তল্লাশীর সময় হুইলার সাহেব ছাত্র স্বার্থে সেখানে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন ছিলেন আরেক জন জাতীয়তাবাদী নেতা। মুর্শিদাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ ১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পট্টভি সীতারামাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত সময়ে মাসিক দেড়শো টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজে সংসৃক্ত পড়িয়েছেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পণ্ডিত সিতারামাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অম্বিকা চরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভুপেন্দ্র নাথ বসু এবং বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে প্রাচীনপন্থী নেতা বললেও বৈকুণ্ঠনাথ সমস্ত আধুনিক সংস্কারের পুরোভাগে থাকতেন। স্বদেশী যুগেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে বহরমপুর লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড তৈরি হলে মহারাজা নিজে হন ডাইরেক্টর বোর্ডের প্রধান। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন খান বাহাদুর খোন্দকার, ফজলে রব্বি। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ছিলেন আরেকজন জাতীয়তাবাদী নেতা, মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক হওয়া সত্তেও তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন।

সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। উপযুক্ত পরিবেশে তাঁরা নানা মানবিক কাজ করে গেছেন। মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন রামমোহন তাঁর একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। মুর্শিদাবাদে থাকাকালীনই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন 'বঙ্গ দর্শন', লেখেন রায়তদের পক্ষে। ১৮৫০ থেকে মুর্শিদাবাদে বাস করতে থাকেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। প্রথমে জজপণ্ডিত হিসাবে, তারপর কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। বাংলার কৃষকদের জীবন নিয়ে লেখেন রেভাঃ লাল বিহারী দে, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সুক্লের প্রধান শিক্ষক থাকার সময়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮১৪-এ। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত সময়ে মাসিক দেড়শ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজে সংসৃক্ত পড়িয়েছেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৬ সাল থেকে শুরু করে ছয় বছর গণিত ও আইন পড়িয়েছেন বহরমপুর কলেজে।

বলা যায় ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রকাশ উনিশ শতকে নবজাগরণের

সময় বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চেতনা এই সময়ে গড়ে ওঠে। মফঃস্বল বুদ্ধিজীবীরা কখনো ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছেন, কখনো সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাজে ফুটে উঠেছে পশ্চিমি এবং দেশীয় সত্তার মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী দিকগুলি। দেশীয় জনসাধারণের প্রতি দরদে তাঁদের খামতি ছিল না। তাঁরা আধুনিকতার পথে গেছেন পশ্চিমী রীতিতে। তাঁরা জনগণকে সচেতন করেছেন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন স্বাধীনোত্তর যুগেও সেই কাজের ভূমিকা অপরিসীম।

উৎস:

ইংরাজী

1.Imagined Communities : Reflections on the origin and spread of nationalism(London : Verso,1983)

2.Asok Sen : Iswar sChandra Vidyasagar and his elusive molestones (Calcutta, Riddhi-India,1977) 3.The will of Raja Krishnath, published in the Murshidabad Zilla Gazetteer, 2003

4..Krishnath College Centenary Commemoration Volume, 1853-1953

5. Sumit Sarkar: Modern India

6. Susobhan Sarkar: Notes on the Bengal Renaissance

বাংলা

নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত) ঃ বাংলার নবজাগরন- তর্ক ও বিতর্ক

প্রাক্তণী, কৃষনাথ কলেজ, ২০০৩ (প্রবন্ধ- বাংলার নবজাগরণ কৃষনাথ কলেজ ও মুর্শিদাবাদের ব্যক্তিত্ব -অনিরুদ্ধ দাস)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত) সাহিত্যসাধক চরিতমালা খণ্ড.৬)

মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, শারদীয়া,১৪০২ বঙ্গাব্দ।

জঙ্গীপুর সংবাদ (পত্রিকা) ৩০ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

সাত দশক, সমকাল ও আনন্দবাজার (আনন্দ পাবলিশার্স)

প্রফুল্ল কুমার গুপ্তঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ।

দেবব্রত ধবঃ কৃষনাথ রামদাস হুইলার ও সমসাময়িক মুর্শিদাবাদ সমাজ

বাঙালীর তুলিতে বাঙালী ভাস্বর ভারতের সংবিধানে৷

শ্যামল দাস

(লেখক ‘ইতিহাস পরিক্রমা’ নামক গবেষনা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক৷ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কেন বাঙালী রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র বসু ব্রাত্য সংবিধানের মধ্যে তার উত্তর খুঁজেছেন শ্যামল দাস৷)

ভারতের সংবিধানে বাঙালির তুলিতে ভাস্বর রয়েছেন বাংলা তথা ভারতের গৌরব একজন বাঙালী। প্রায়ই শোনা যায় ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী ব্রাত্য। বাস্তবে দেখাও গিয়েছে তাইই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো শুরু সেই বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে। একথা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক ভারতের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করেছিলেন। বাস্তবে দেখাও যায় বাঙালী আজ যা চিন্তা করছে বাকী ভারতবর্ষ তা চিন্তা করছে আগামীকাল। বাঙালীর দেশপ্রেম বা কার্যকারিতা জওহরলালের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করাটাই বোধ হয় বাঙালীর চিন্তা শক্তি ও কার্য্কারিতার সর্বশেষ স্বীকৃতি। এরপর ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। সত্যিই কি তাই নাকি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বাঙালীর চিন্তা ও কার্যকারিতা চাপা পড়ে রয়েছে ভারতের চালিকা শক্তির দ্বারা

সবাই জানেন ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায়। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ঐ সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ভারত প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারী। আর সংবিধান ভারত সরকার দ্বারা নোটিফায়েড হয় ১৯৫০ সালের ১০ মে। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় প্রস্তুত ভারতের নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত ভারতের সংবিধান ভারত সরকার প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালেই।

ভারতের নাগরিকদের কাছে আজ এক বিরাট প্রশ্ন যে সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। সেই সংবিধানই কি হুবহু ছেপে প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাকি হয়েছিল ছাঁট কাট – কাট কুট ইত্যাদি যে সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল – স্বাক্ষর করেছিলেন সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ১৭৬ জন জনপ্রতিনিধি, যে সংবিধানের বাইশটি পরিচ্ছদের পাতায় অলঙ্কৃত ও ছবি প্রকাশিত হয়েছিল জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির ভারতের পঞ্চাশ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা মেনে – যে দার্শনিক ব্যাখ্যা সঠিক ভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল বাঙালি শিল্পী গান্ধি – রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানে সেই সংবিধান হুবহু কি প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর

১৯৪৯ সালে প্রিন্টেড বাই ম্যানেজার অব্ গভঃ অব্ ইন্ডিয়া প্রেস , নিউ দিল্লি এবং পাবলিসড্ বাই দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস্ দিল্লির দ্বারা প্রাকাশিত ভারতের সংবিধানের প্রথম ছাপা কপিটির সঙ্গে সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধানের আসল কপিটি মেলালেই দেখা যাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রায় সময় থেকেই আমাদের পবিত্র সংবিধানকে ভাঙচুর করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ভারত

সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ১৭৬ জন জনপ্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত আসল সংবিধানটিকে অজ্ঞাত কারণে ভাঙচুর করে এবং হুবহু প্রকাশ না করে মনগড়া কাল্পনিক প্রক্ষিপ্ত একটি সংবিধান প্রকাশ করলেন। সেখানে থাকলনা জনপ্রতিনিধিদের তালিকা ও স্বাক্ষর, অনুপস্থিত রয়েগেল জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির ভারতের পঞ্চাশ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা মেনে প্রতিভাত বাঙালি শিল্পী গান্ধি – রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানের ছবি ও অলঙ্করন। ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধানের ধারাবাহিকতাতেই প্রতিবছর ভারত সকরকারের আইন দপ্তর প্রকাশ করে চলেছে সংবিধান গ্রন্থ যার সঙ্গে অনেকাংশেই মিল নাই আসল সংবিধান গ্রন্থটির। এবং শুনলে আশ্চর্য্ হয়ে যেতে হয় ১৯৫১ সালের ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী থেকে আজ পর্য্যন্ত শতাধিক যতগুলি সংবিধান সংশোধনী হয়েছে তার একটি শব্দও সংযোজিত হয়নি ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থের কোন অংশে। আইন মেনে হয়নি ভ্যালিউম কারেকশনও। অথচ এইদেশটি চলছে ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধান মেনেই।

তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে এদেশে কি দুটি সংবিধান চলছে একটি আসল অন্যটি প্রক্ষিপ্ত। আসলটিকে ধামাচাপা দিয়ে প্রক্ষিপ্তটিকে নিয়ে চলার কারণেই আজ মহান সুভাষচন্দ্র বসু কেন্দ্র সরকারের দেওয়াল পঞ্জিতে অনুপস্থিত।

আসুন দেখে নেওয়া যাক ধামাচাপা দেওয়া ঐ ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থটিতে কি আছে কার নির্দেশে কি ভাবেই বা প্রস্তুত হয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নিয়ম নির্দেশিকা

ভারতের সংবিধানে বাঙালির তুলিতে ভাস্বর রয়েছেন বাংলা তথা ভারতের গৌরব একজন বাঙালী। প্রায়ই শোনা যায় ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী ব্রাত্য। বাস্তবে দেখাও গিয়েছে তাইই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামতো শুরু সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে। একথা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক ভারতের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় পন্ডিত জহর লাল নেহেরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করেছিলেন। বাস্তবে দেখাও যায় বাঙালী আজ যা চিন্তা করছে বাকী ভারতবর্ষ তা চিন্তা করছে আগামীকাল। বাঙালীর দেশপ্রেম বা কার্য্যকারীতা জহরলালের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করাটাই বোধ হয় বাঙালীর চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকারিতার সর্বশেষ স্বীকৃতি। এরপর ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। সত্যিই কি তাই নাকি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বাঙালীর চিন্তা ও কার্য্কারিতা চাপা পড়ে রয়েছে ভারতের চালিকা শক্তির দ্বারা

সবাই জানেন ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায়। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ঐ সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ভারত

প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারী। আর সংবিধান ভারত সরকার দ্বারা নোটিফায়েড হয় ১৯৫০ সালের ১০ মে। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় প্রস্তুত ভারতের নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত ভারতের সংবিধান ভারত সরকার প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালেই।

ভারতের নাগরিকদের কাছে আজ এক বিরাট প্রশ্ণ যে সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, সেই সংবিধানই কি হুবহু, ছেপে প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাকি হয়েছিল ছাঁট কাট - কাট কুট ইত্যাদি যে সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ১৭৬ জন জনপ্রতিনিধি, যে সংবিধানের বাইশটি পরিচ্ছদের পাতায় অলঙ্কৃত ও ছবি প্রকাশিত হয়েছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা মেনে - যে দার্শনিক ব্যখ্যা সঠিক ভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল বাঙালি শিল্পী গান্ধি - রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানে সেই সংবিধান হুবহু কি প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর

১৯৪৯ সালে প্রিন্টেড বাই ম্যানেজার অব্ গভঃ অব্ ইন্ডিয়া প্রেস , নিউ দিল্লি এবং পাবলিসড্ বাই দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস্ দিল্লির দ্বারা প্রাকাশিত ভারতের সংবিধানের প্রথম ছাপা কপিটির সঙ্গে সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধানের আসল কপিটি মেলালেই দেখা যাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রায় সময় থেকেই আমাদের পবিত্র সংবিধানকে ভাঙচুর করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ১৭৬ জন জনপ্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত আসল সংবিধানটিকে অজ্ঞাত কারণে ভাঙচুর করে এবং হুবহু প্রকাশ না করে মনগড়া কাল্পনিক প্রক্ষিপ্ত একটি সংবিধান প্রকাশ করলেন। সেখানে থাকলনা জনপ্রতিনিধিদের তালিকা ও স্বাক্ষর, অনুপস্থিত রয়েগেল জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা মেনে প্রতিভাত বাঙালি শিল্পী গান্ধি - রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানের ছবি ও অলঙ্করণ। ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধানের ধারাবাহিকতাতেই প্রতিবছর ভারত সরকারের আইন দপ্তর প্রকাশ করে চলেছে সংবিধান গ্রন্থ যার সঙ্গে অনেকাংশেই মিল নাই আসল সংবিধান গ্রন্থটির। এবং শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ১৯৫১ সালের ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী থেকে আজ পর্যন্ত শতাধিক সংবিধান সংশোধনী হলেও তার একটি শব্দও সংযোজিত হয়নি ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থের কোন অংশে। আইন মেনে

হয়নি ভ্যালিউম কারেকশনও। অথচ এইদেশটি চলছে ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধান মেনেই।

তাহলে প্রশ্ণ উঠে আসে এদেশে কি দুটি সংবিধান চলছে একটি আসল অন্যটি প্রক্ষিপ্ত। আসলটিকে ধামাচাপা দিয়ে প্রক্ষিপ্তটিকে নিয়ে চলার কারণেই আজ মহান সুভাষ চন্দ্র বোস কেন্দ্র সরকারের দেওয়াল পঞ্জিতে অনুপস্থিত।

আসুন দেখে নেওয়া যাক ধামাচাপা দেওয়া ঐ ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থটিতে কি আছে কার নির্দেশে কি ভাবেই বা প্রস্তুত হয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের নিয়ম নির্দেশিকা

চলবে

সুবে বাংলার গদ্দিনসীন বেগম

সৈয়দ আসিফ আব্বাস মীর্জা ও রোকসানা মীর্জা

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ইতিহাসে মীর মোঃ জাফর খাঁনের পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, যেটা ভারতীয় ইতিহাস রচনায় যথার্থ ছাপ ফেলেছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক এই পরিবারকে বদনাম করলেও সকলকে এই সত্যটা স্বীকার করতে হবে যে এই পরিবার যা কিছু করে বা রেখে গিয়েছেন, সেটা আমাদের জন্য এক গর্বের বিষয়। বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব নাজিমদের পাশাপাশি তাঁদের বিবাহিত স্ত্রী বা গদ্দিনসীন বেগমদেরও (Chief lady of the state) এক গুরুত্বপূর্ণ পদ বা জায়গা ছিল। এই গদ্দিনসীন বেগমরা এই রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার বিশেষ করে মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এই গদ্দিনসীন পদ বা মসনদটি ছিল মুন্নি বেগম সাহেবাব, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'মা' নামে বিখ্যাত। গদ্দিনসীন বেগমের মসনদে প্রথম জায়গা গ্রহণ করেন নবাব মুন্নি বেগম সাহেবা ও দ্বিতীয় নবাব বব্বো বেগম সাগেবা। যাঁরা ছিলেন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার প্রথম নাজাফি বংশধরের সুবেদার মীর মোঃ জাফর খাঁনের স্ত্রী। সুবা বাংলার মোট সাতজন গদ্দিনসীন বেগম হয়েছিলেন যার মধ্যে অন্তিম বেগম হচ্ছেন নবাব শামি্স জাহান বেগম ফিরদশ মেহেল সাবেবা যিনি সুবা বাংলার শেষ নবাব নাজিম নবাব ফিরাইদ্দুণ জাঁ-এর স্ত্রী ছিলেন। ফিরদশ মেহেলের মৃত্যুর (১৯০৫) পর তৎকালীন ভারত সরকারের দ্বারা এই গদ্দিনসীন বেগমের পদটি শেষ করে দেওয়া হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করার আগে থেকেই মীর জাফরের বেগম প্রধান মহিলা(Cheif lady) হিসাবে ৬০০ টাকা প্রতি মাসে বৃত্তি হিসাবে পেতেন। এই টাকা সরাসরি বাংলা, বিহার ও উড়িশার Revenue থেকে দেওয়া হত যেটা

নবাব নাজিমের আয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। যার মধ্যে নবাব নাজিমের কোন দখল বা হস্তক্ষেপ ছিল না। নবাব নাজিম নাজিমুদৌল্লার মৃত্যুর পর থেকে এর পরিমাণ বেড়ে হয় ১২০০০ টাকা প্রতি মাস। কোম্পানির দেওয়ানি লাভ করার পর (১৭৬৫ থেকে নবাব মুন্নি বেগমের মৃত্যু (১৮১৩ পর্যন্ত এই ১২০০০ টাকা বৃত্তি প্রতি মাসে নির্ধারিত ছিল। তারপর গদ্দিনসীন বেগমের বৃত্তি কমে ৭,৭৯৮ সিক্কা (Sicca = Rs. 99, 821 - 4 -11 per annum) প্রতি মাস হয়, যেটা চলতে থাকে শেষ গদ্দিনসীন বেগম ফিরদশ মেহেল অবধি।

গদ্দিনসীন বেগমদের তালিকা ,–

(১) নবাব মুন্নি বেগম (---- 1813)

(২) নবাব বাব্বো বেগম (---- 1810)

(৩) নবাব ফাইজুন নিশা বেগম (1813 - 1820)

(৪) নবাব আমিরুন নিশা বেগম (1820 - 1858)

(৫) নবাব নাজিরুণ নিশা বেগম (1858 - 1859)

(৬) নবাব রাইসুন নিশা বেগম (1859 - 1893)

(৭) নবাব শামসি জাহান বেগম (1893 - 1905)

গদ্দিনসীনের পদটি দেওয়া হত নবাব নাজিমের প্রধান স্ত্রী বা মুখ্য মহিলা বা বিধবাকে যিনি হতেন ওই পদটির প্রকৃত যোগ্য। এক সময় একজন বেগমই যোগ্য হতেন এই পদটির জন্য এবং আজীবন। উনি সরাসরি সরকারের পক্ষ থেকেই নিয়োগ ও সম্মানিত হতেন। গদ্দিনসীন বেগমদের হাতে নির্ধারিত allowance, গহনা এবং এর সাথে বেশ কিছু মাহাল এবং ডিউরিজ পরিচালনা করার সরাসরি ক্ষমতা থাকত। এই পরিচালনার মধ্যে নবাব নাজিমের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। এটা একটি রাজনৈতিক পদ হওয়ার জন্য যে কোন গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ বা ইস্তফা দেবার তথ্য আলাদা ভাবে গদ্দিনসীন বেগমদের জানানো হত। তাছাড়া যুদ্ধ ও শান্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও গদ্দিনসীন বেগমদের আলাদা ভাবে জানানো হত। এছাড়া নিজামত পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা সমস্যাগুলোও দেখতেন গদ্দিনসীন বেগম।

(১ নবাব মুন্নি বেগম সাহেবা ,–(------ 1813)

মুন্নি বেগম সেকেন্দ্রার কাকে বালকন্ড গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৪ সালে তিনি সামান আলির সঙ্গে দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদ আসেন। তারপর তাঁর বিয়ে হয় মীর মোঃ জাফর খাঁনের সঙ্গে। খুব শীঘ্রই তিনি সুবা বাংলার রাজনীতিতে এক বিশেষ জায়গা করে তোলেন। রাজনৈতিক পারদর্শীতার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই জন্য তাঁকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ' মা' বা'Mother of east India company' বলা হত। উনি শুধু লর্ড ক্লাইভ ও কোম্পানিকে মূল্যবান উপহার দেওয়ার জন্য বিখ্যাত নন, এর সাথে বিধবা মহিলা ও গরীব মেয়েদের সাহায্য করার জন্যও তাঁর যথেষ্ট সুনাম

রয়েছে। ভীষণ সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে উনি এক পারদর্শী নর্তকীও ছিলেন। ১৭৬৫ সালে মীর জাফর খাঁনের মৃত্যুর পরে উনি ক্লাইভ এবং কোম্পানিকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেন। যার ফলে তাঁর ছেলে নাজমুদ্দৌলাকে সুবা বাংলার নবাব নাজিম করা হয় এবং মুন্নি বেগম থাকেন নবাবের গার্জেন। মুন্নি বেগম হয়ে উঠেন সুবে বাংলার প্রথম গদ্দিনসীন বেগম। বার্ষিক ১৪ লাখ টাকার সাথে সাথে উনি বিভিন্ন রকমের বৃত্তি পেতেন Bangal Revenue থেকে। নাজমুদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর মুন্নি বেগমের ছোট ছেলে নবাব সাইফউদ্দৌলা সুবা বাংলার নাজিম হয়েছিলেন। ১৭৬৭ সালে চক বাজারে একটি বিশাল মসজিদ তৈরি করেছিলেন মুন্নিবেগম। যেটা 'চক মসজিদ' নামে আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মুন্নি বেগম ১৮১৩ সালে ৯৫ বছর বয়সে মারা যান। মুর্শিদাবাদের শাহী কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মুন্নি বেগমের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার সাথে দেড় লক্ষরও বেশি সোনা এবং চাঁদির সিক্কাও ছিল। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল ১ কোটি টাকারও বেশি। যেটা তাঁর মৃত্যুর পর 'মুন্নি বেগম ফান্ড' রূপে রাখা হয়। পরবর্তী কালে সেটা নিজামত ডিপোজিট ফান্ড-এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়।'Nizamat Deposit Fund' ---- নিজামত পরিবারের সদস্যদের ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আজও নিজামত হোস্টেল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিজামত খরচা এই Fund থেকে বহন করা হয়।

(২) নবাব বাব্বো বেগম সাহেবা ,-(---- 1810)

বাব্বো বেগম সাহেবা সামান আলি খানের কন্যা ছিলেন। ১৭৪৬ সালে এক্রামোদ্দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠানে সামান আলি দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে মীর জাফর খানের সঙ্গে বাব্বো বেগমের বিয়ে হয়। বাব্বো বেগম সাহেবার ছেলে মুবারকদ্দৌলা। ১৭৭০ সালে ১১ বছর বয়সে বাংলা, বিহার ও উড়িশার নাজিম হয়েছিলেন এবং বব্বো বেগম সাহেবাই ছিলেন নবাবের গার্জেন। নবাব বব্বো বেগম সাহেবা মাসিক ৮০০০ টাকা বৃত্তি পেতেন। ১৮১০ সালে বব্বো বেগমের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদের শাহী কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

(৩) নবাব ফাইজুননিশা বেগম নবাব ফাইজুননিশা বেগম নবাব মুবারকদ্দৌলার স্ত্রী ছিলেন। ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা নান্দিরা বেগম ছিলেন সুবা বাংলার প্রথম নবাব নাজিম মুর্শিদকুলি খাঁনের পরিবারের। ৩০ ডিসেম্বর ১৮২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদের শাহী কবরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

৪ নবাব আমিরুননিশা দুলহীন বেগম ,-(1820 - 1858)

নবাব আমিরুননিশা দুলহীন বেগম ছিলেন নবাব নাজিম জ্যাইনুদ্দিন আলি জাঁর স্ত্রী। দুলহীন বেগমের বাবা ছিলেন নবাব সৈয়দ আকবর আলি খাঁন বাহাদুর। নবাব দুলহীন বেগমের পেনসন ছাড়া ছিল বহু মাহাল, যেটা উনি সরাসরি পরিচালনা করতেন। ফারাইদুন জাঁ যখন নবাব নাজিম হন তখন দুলহীন বেগমের সম্পত্তি থেকে উনি ৩৩ টি মাহাল পেয়েছিলেন। দুলহীন বেগম বহু সামাজিক উন্নয়ণের কাজ করেছেন। তাঁর তৈরি করা সুন্দর মসজিদ এখনও রয়ে গেছে কিলা নিজামতে। নবাব দুলহীন বেগম বেশ কিছু সম্পত্তিও কিনেছিলেন। পরগনা গোপীনাথপুর দুলহীন বেগমের কেনা একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। যার সরকারি বিবরণ হল ----

Schedule of properties

"Zamindari pargana Gopinathpur, Numbered - 76, in the Tauzi of the Collectrate of zilla Murshidabad, bearing a Sadarjama of Rs. 7354 - 13".

২১ জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে নবাব দুলহীন বেগম মারা যান। তারপর উক্ত সম্পত্তির মালিক হন তৎকালীন নবাব নাজিম ফারাইদুন জাঁ। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ সালে নবাব নাজিম ফারাইদুন জাঁ এই সম্পত্তিটি একটি ডিড-এর মাধ্যমে উপহার হিসাবে দিয়ে যান নিজের তৃতীয় পুত্র সাহিবজাদা সৈয়দ মোঃ আলি মির্জ ওরফে আমীর সাহাবকে। ওই Deed –এর কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে।

"In Perpetuity for his own personal use and benefit during the natural term of his Life and after him unto the heirs male of his Loins, generation by generation, and on the failure of hair of the male line unto the hairs of the famale line, generation by generation all and singular the Zamimdaries, mourasi , patni and darpatni tenures and Landed properties of whatsoever nature including gardens which belonged to the late Nawab Ameerun nisa Begum alias Dhoolin Begum, and Which stood either in the deceased Begum own name or benami for her in the names of her relatives and dependants, to have and to hold the same for his and after him their use, enjoying during the natural term of his life and after him their lives, in their generations each and successive. The rent revenue and usufruct of the naid Landed properties won possesing the power to alicnate, nell or dispase of in any way either the whofe or dispase of in any portion of the naid properties also know all men by thse prements, that neither the prement devisee , him thira at any time has or thall have the power at any time has or thall home the power to mortgage, or tender in Payment of any olebt or debts he or they may Contracr the naid properties od any portion there of an that naid properties counracting debt, the naid properties nhall by virtme of thir deed, lvithout incumbrance deremd sile the next legal heir".

(5) নবাব নাজিবুন নিশা বেগম ,– [1858 - 1859]

নবাব আমিরুল নিশা দুলহিন বেগমের মৃত্যুর পরে গদ্দিণশীন বেগম হন নবাব নাজিবুন নিশা বেগম সাহেবা। তিনি ছিলেন নববা নাজিম ওয়ালা জাঁ এর প্রথম স্ত্রী। উনি মাত্র এক বছরের জন্য গদ্দিণশীল বেগম ছিলেন। উনার দায়িত্বে ছিল বেশ কিছু মাহাল ও ডিউড়ি। উনি 23 শে August 1659 সালে মারা যান।

(6) নবাব রাইসুননিশা বেগম,– [1859 - 1893]

নবাব নাজিম, হুমায়ুণ জাঁ এর স্ত্রী এবং শেষ নবাব নাজিম ফারাইদুন জাঁ এর মা নবাব রাইসুন নিশা বেগম সাহেবা ষষ্ঠতম গদ্দিণশীন বেগম হয়েছিলেন। উনি প্রায় একলক্ষ টাকা মত পেনসেন পেতেন। উনি কিছু মাহাল, ডিউড়ি ও নিজেব Estate পরিচালনা করতেন। উনি সামাজিক কাজ, মহিলাদের শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বেগম সাহেবা বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক ছিলেন যেটা এখনও অবস্থিত রয়েছে। নিজামত ফ্যামেলির রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ওঁর মৃত্যুকালের সময় ওঁর সম্পত্তি ছিল প্রায় Rs. 2,90,37,91 টাকার বেগম সাহেবা 4 the may 1893 সালে মুর্শিদাবাদে মারা যান। উনার সম্পত্তির বিবরণ তালিকা নিচে দেওয়া হল।

SCHEDVLE A

PARI -- I

gmmoveable properties

Renemue paying estates

value: , 15, 990/-

PART - II

Lalhirak Lauds, lotes and gardens

value ----- 26, 403 /-

Houses value ---- 55, 000/-

Moveble ---

Those told in Calcutta ---

value ---- 1,09,479/-

Those sold in cily Murshidabad--

value --- 80, 900/-

GRAND

Total -- 2,90,379/-

(Reference: Suit: 233 of 1895

at Murshidabad court)

Dirtricl

(7) নবাব সামসি জাহান বেগম,– (1893 -- 1905)

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শেষ নবাব নাজিম ফারাইদুন জাঁ এর স্ত্রী Her Highness Firdous Mahal Nawab Somsi Jahan Begum সাহেব C.I যিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন শেষ গদ্দিণশীন বেগম। উনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রভাবশালি মহিলা ও উচ্চ বংশের কন্যা ছিলেন। উনার জন্ম 1834 সালে মুর্শিদাবাদে হয়। নবাব নাজিম ফারাইদন জাঁ এর সঙ্গে উনার বিশাল জাক জমাটভাবে 1846 সালে বিবাহ হয়। অন্যান্য গদ্দিণশীন বেগমের মতও উনি ১ লক্ষ টাকা পেনসেন পেতেন এবং পরিচালনা করতেন নিজের Estate কে। সামসী জাহান বেগম মোট ১৮ টি সন্তানদের জন্ম দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিশষ যে মাত্র একটি পুত্র prince syed Islanoler Ali Meerza Alias Sultan Sahib ও দুটি কন্যা সন্তান জিবীত ছিলেন।

1888 স◌ালে বেগম সাহেবা নিজের সন্তান কে নিয়ে তীর্থতে গিয়েছিলেন মক্কা এবং মন্দিনা। ফেরার পথে উনি Bombay কিছু সময়ের জন্য বাস করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে 1893 সালে উনার একমাত্র সন্তান Sultan Sahib কোলকাতাতে মাত্র 36 বছর

বয়সে হঠাৎ মারা যান। এবং সেই বছরে British Sarkar বেগম সাহেবা কে গদ্দিণশীন বেগমের উপাধি যেটা ছিল বিখ্যাত মুন্নি বেগমের উপাধি প্রদান করেন।

সামসি জাহান বেগম যুক্ত ছিলেন বহু সামাজিক কাজের সঙ্গে। বিশেষ করে বিধবা ও গরীব মহিলাদরে জন্য কাজ করেছেন। সামসি জাহান বেগম।

9 September 1898 সালে একটি ওয়াকাফনামা করেন যার দ্বারা তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি ও Estate কে দরিদ্র মানুষ ও সামাজিক উন্নয়ণের জন্য ওয়াকাফ (দান) করে দেন।

সামসি জাহান বেগম পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের শিক্ষা নিয়ে বিশেষ ভাবে উদ্যোগে নিয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে উনি প্রথম মুসলিম মহিলা ছিলেন যিনি প্রথম ওয়াকাফনামা তৈরী করেন। যার মধ্যে মহিলা শিক্ষার বিশেষ ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছিল।1915 সালে মেটিয়া ব্রুজে (কোলকাতায়) বেগম সাহেবার ওয়াকাফ সম্পত্তি থেকে বেগম সাহেবার নামে তৈরী হল ‘ সামসীয়া জানানা মাদ্রাসা’। এটা ততকালীন প্রথম মাদ্রাসা ছিল। এখানে শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ ও পেশাগত কাজও শেখানো হত। এই মাদ্রাসটি আজও সমাজকে উজ্জলতা প্রদান করে চলেছে। ২১ April 1905 সালে কোলকাতাতে বেগম সামসী জাহান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথেই শেষ হয়েযায় বাংলা, বিহার, ওড়িশার গদ্দিণশীন বেগম পদটি।

মুর্শিদাবাদে চরক বা গাজন উৎসব

‘‘সংবাদদাতা , বহরমপুর : বৌদ্ধ মতাবলম্বী ‘নাথ যোগীরাই’ রাঢ় বাংলায় চরক উৎসবের প্রবর্তক। বহু ইতিহাসবীদ এমনটাই দাবি করেছেন। ইতিহাস গবেষকদের বক্তব্য , যোগীদের একটা অংশ পরবর্তীতে‘নাথ সম্প্রদায়’ হিসাবে খ্যাত হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায় ‘বুদ্ধ’ নাম মুছে ফেলে নাথ যোগীরা শৈব মত গ্রহণ করে। কান্দির রুদ্রদেব সহ একাধিক দেবদেবীর মূর্তিতে বৌদ্ধ মূর্তির ছাপ রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের মূর্তিগুলির মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধমূর্তি। মর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলের বহু দেবালয়ে শিবরুপে পুজিত মূর্তি আসলে বৌদ্ধ মূর্তি বলে দাবি করা হয়েছে। কান্দির রুদ্রদেব বুদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। মূর্তির মাথার উপর বৃক্ষশাখা বোধিদ্রুম বলেই প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া কর্ণসুবর্ণে , পাঁচথুপির মুনিয়াডিহিতে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। সামশেরগঞ্জের জিয়ৎকুঁড়ি , সাগরদিঘি , মহিপালে দেব-দেবীর যে প্রস্তর ফলক মিলেছে তার বেশিরভাগে রয়েছে বৌদ্ধমূর্তির নিদর্শন।

এরসঙ্গে চড়কের গাজনের কি সম্পর্ক সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ইতিহাস গবেষকদের মতে , অবিভক্ত বাংলার বহু গ্রামে সেই সময় ধর্মপুজো হত। মুর্শিদাবাদে আড়ম্বরের সঙ্গে পুজোপাঠ শুরু হয়। দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষ ব্রাহ্মণ ছাড়া এই পুজো করত। এই পুজো প্রচলন বা প্রচারের জন্য হুঙ্কার বা গর্জন ছাড়া হত। গর্জন অপভ্রংসে গাজন। গাজন হল ধর্ম প্রচার। গোবিন্দচন্দ্রগীতে রয়েছে , হুঙ্কার ছাড়িলে যুগি (যোগি) জোগ করি সার। গাজন উৎসবে যে চড়ক পুজোর প্রচলন হয় তার মধ্যেও বৌদ্ধ রীতিনীতির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। ঘূর্ণায়মান চড়ক বৌদ্ধধর্মচক্রের প্রতিকীরুপ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই উৎসবের ব্যাপক প্রচলন সেই সময় থেকেই চলে আসছে। চড়ক উ্ৎসবকে কেন্দ্র করে এখন জেলার বিভিন্ন জায়গায় মেলাও বসে। কান্দির রুদ্রদেব , নওদার চাঁদপুর মাণিকনগরের ‘আদম-গাদমের’ সঙ্গে জড়িত লোককথাও মানুষকে আকৃষ্ট করে।

নওদার আদম গাদম মূলত দুটি কাঠ যা মাটি থেকে উঠে আসে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সেই কাঠের একটিতে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় এক গোয়ালা দুধ ঢেলে আগুন নেভান। তারপর থেকে আদম গাদমকে দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। গ্রামের মানুষের দাবি , সারা বছর জলে পড়ে থাকে কাঠ দুটি । কোথায় রয়েছে কেউ খুঁজে পায়না। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তিতে দুটি কাঠ ভেসে ওঠে। বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজো হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে এক মাস মেলা চলে।

কান্দির রুদ্রদেব চৈত্র সংক্রান্তিতে রুপপুরের বাবার বাড়ি থেকে বার হয়ে হোমতলায় আসেন। গাজন সন্যাসিদের মাথায় চেপেই রুদ্রদেব হোমতলায় আসেন। তবে তিনি কোন পথে আসবেন তার কোন ঠিক থাকেনা। কান্দির মানুষের বিশ্বাস রুদ্রদেব গাজন সন্যাসিদের যে পথ দিয়ে নিয়ে আসেন সন্যাসিরা পাগলের মত সেই পথ

দিয়েই আসে। রুদ্রদেবের যাওয়ার পথ হয় দুর্গম। বাড়ির পাঁচিল কিংবা পুকুরের উপর দিয়ে বা কাঁটা ঝোঁপের উপর দিয়েই হয় রুদ্রদেবের পথ। হোমতলায় আসার পথে বিশ্রাম তলায় রুদ্রদেবকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। হোমতলা ও বিশ্রামতলায় বসে বিরাট মেলা। গাজন সন্যাসিরা এখানে মড়ার মাথা নিয়ে গাজন করে। মড়ার মাথা খেলানো হয়। ডোমকল এলাকাতেও মড়ার মাথা নিয়ে নাচ করে সন্ন্যাসীরা।

সালারের কাগ্রামে গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। গাজন সন্ন্যাসীদের এখানে দশ ফুট উঁচু মাচান থেকে লাইন দিয়ে সাজিয়ে রাখা ধারালো বঁটির উপর ঝাঁপ দিয়ে গাজন সন্ন্যাসের প্রমাণ দিতে হয়। কথিত আছে যাদের উপবাস পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকে তাদের শরীরেই রক্তপাত হয়। অনেকে শরীরে বাণ ফুটিয়েও নিজেদের প্রমাণিত করেন। গাজন সন্ন্যাসিরা তিনদিন , সাতদিন , পনেরো দিন বা এক মাসের উপবাস রাখেন। তবে যাঁরা শরীরে বাণ বা বঁড়শি ফোটায় তাদের এক মাসের উপবাস রাখতে হয়।

বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার মাঠেই তিনটি চড়ক গাছ পোঁতা হয়। গোরাবাজার শ্মশানঘাটে চড়ক গাছ পুঁতে চড়ক উৎসব পালন করা হয়। শ্মশানঘাটে ও খাগড়া রাধারঘাটে চড়ক উৎসবে মেলা বসে। বড়ঞা , চৈৎপুর, সাগরদিঘি, রঘুনাথগঞ্জ, গোকর্ণ,বেলডাঙ্গা, রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া এলাকাতেই মহা আড়ম্বরে চড়ক উৎসব পালিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক উৎসব হলেও মাসের শুরু থেকেই পথে নেমে পড়ে গাজন সন্ন্যাসী ও সংয়ের দল। সারা চৈত্র মাস জুড়েই মুর্শিদাবাদের গ্রাম শহর মাতায় গাজনের দল।’’